সকালবেলা
সাপ্তাহিকী

রবিবার সকালবেলা কাগজের সঙ্গে বিনামূল্যে

২ সেপ্টেম্বর ২০১২

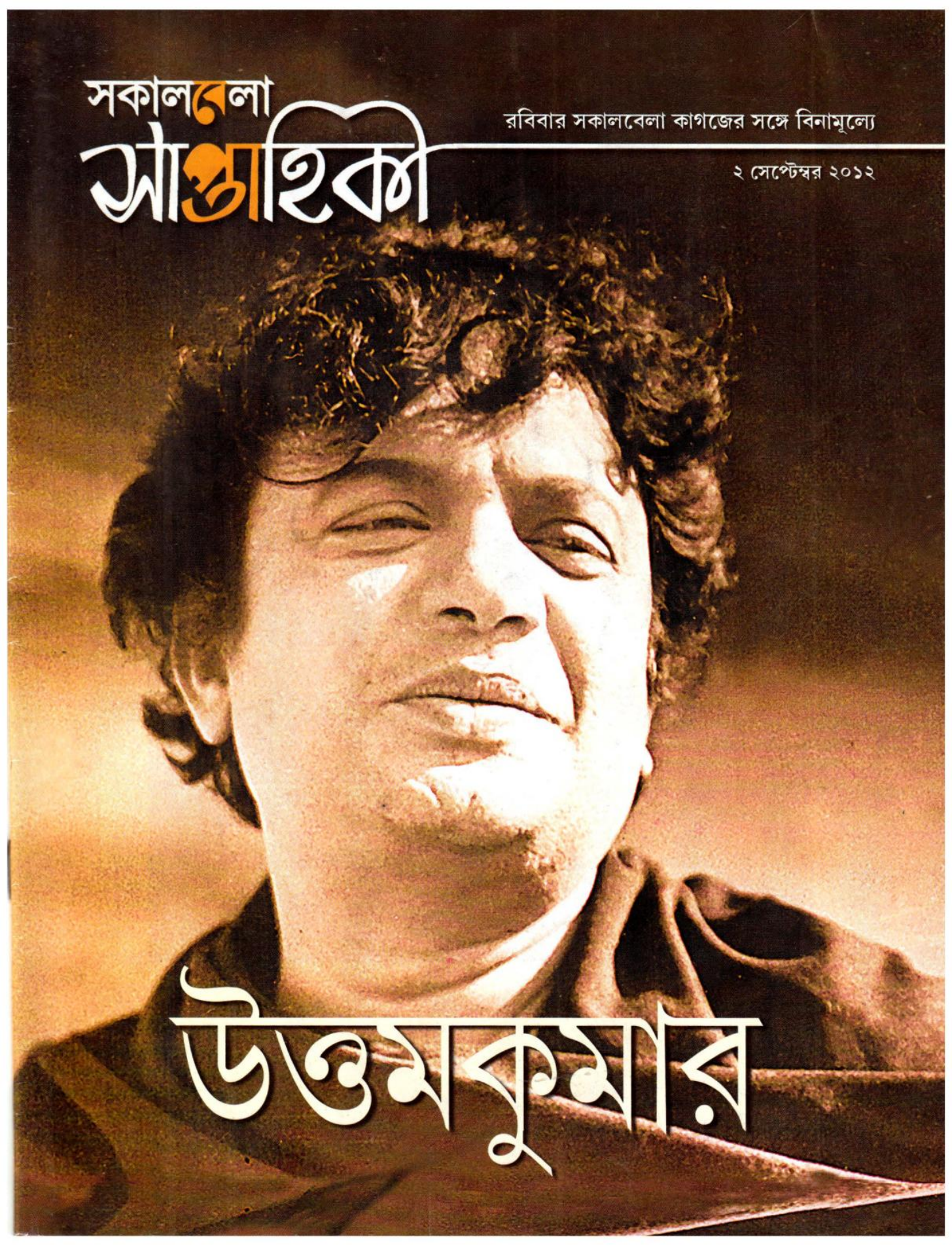

উত্তমকুমার

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স

সঞ্চয় প্রকল্প

গয়না কেনার সবচেয়ে বেশি
লাভজনক সঞ্চয় প্রকল্প

Shyam Sundar Co.
Jewellers

125 Rashbehari Avenue, Kolkata 700 029 Telephone 2419 8822/24
Near Triangular Park

concepts@resourceindica.com

সকালবেলা সাপ্তাহিকী
২ সেপ্টেম্বর ২০১২

SARADHA

সূচিপত্র

সাধুসঙ্গ
একাদশীর ব্রত ও তার ফল **শিবশংকর ভারতী** ২

ধারাবাহিক উপন্যাস
টুটিলাওয়ার টাঁড়ে **বুদ্ধদেব গুহ** ১৬

গল্প
সাময়িক সংলাপ **কানাই কুণ্ডু** ২৩

কবিতা
রণজিৎ দাশ, উজ্জ্বল সিংহ,
মৌ ভট্টাচার্য, তিলোত্তমা বসু ১৫

প্রচ্ছদ কাহিনি
উত্তমকুমার **আশিসতরু মুখোপাধ্যায়, বব দাস**
ও সমীরকুমার ঘোষ ৮

বাইরে দূরে
অসাধারণ কিন্নর কল্লা **আবীর গুপ্ত** ১৯

সিনেমা-টিভি-নাটক ৩৩

খেলা
এবার কব্জির ভেলকি দেখাবেন কে? : **অভিরূপ দত্ত** ৩৮

নিয়মিত বিভাগ
বইপত্র-৪ চিত্র প্রদর্শনী-৬ সুস্থ থাকতে-২৬ রূপটান-২৫
কেনাকাটা-৩২ রেলসূচি ও উড়ানসূচি-২৮ ভূরিভোজ-৩০
ভাগ্য-৪০

সম্পাদক : সুদীপ্ত সেন
সাপ্তাহিকী সম্পাদক কাকলি চক্রবর্তী

যোগাযোগ— সকালবেলা সাপ্তাহিকী, দ্য নলেজ হাব, ষষ্ঠ তল,
ডি এন ২৩, সেক্টর-৫ কলেজ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই-মেল— sakalbela.saptahiki@sakalbela.com

সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতি

চাঁদিপুর সমুদ্রতীর, চিরনতুন সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতি, বেলাভূমি, বালির টিলা, মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশ, মন কেমন করা ঝড়ো হাওয়া...ঝাউবন ও আপনি। রয়েছে পাহাড় নীলগিরি-ঝরনা আর পাহাড়ি পথ। যেখানে সময়সীমা না মেনে হেঁটে চলা যায়। যত খুশি... একা অথবা সঙ্গীকে নিয়ে।

আনন্দময়ী হোটেল (প্রাঃ) লিমিটেড
আপনাকে আতিথেয়তা দেবার জন্য প্রস্তুত
ছুটির দিনগুলি ভরিয়ে তুলুন মোহময় মুহূর্তে

Booking Office:

1. Eastern Co. (P) Ltd. (22207094, 22101822)
2. Sayan International (23374344)
3. Travel Tips (25772203)
4. Dolphin Holidays (25550702/4652)
5. Max Tours & Travels (23541436)
6. Tour Help (25393371)
7. Holiday Manager (22485829)
8. Ace-Con (2440 4384/3403)
9. Diamond Tours & Travel (22120459)
10. Synthesis Holidays (9230222033)

ANANDAMAYEE HOTEL PRIVATE LIMITED

Corporate Office:
47/4, Becharam Chatterjee Road, Behala, Kolkata-700034
Ph. 23970427, 32407337, Fax: 23970427
E-mail: info@anandamayeehotel.com
Website: www.anandamayeehotel.com
All major Credit Cards accepted

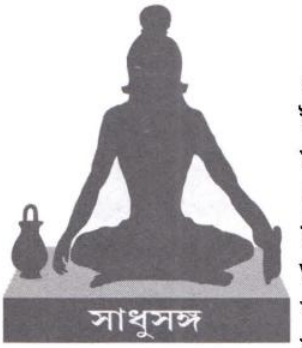

দেহাদির বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন। আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— তিনিই আত্মা। মূল কথাটা হচ্ছে, আত্মিক উন্নতিকল্পে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত বা জয় করার জন্যেই করা হয় একাদশী ব্রতপালন।

একাদশীর ব্রত ও তার ফল

শিবশংকর ভারতী

এখন বেলা প্রায় একটা। পুনম আর আমি বসে গেলাম সাধুদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে তবে এক,সারিতে নয়। আগের রাতের মতো আসনটা একটু আলাদাভাবে পাতা। জলের গ্লাস আর পাতা দিয়ে গেলেন একজন সন্ন্যাসী। আশ্রমের অন্য সকলে বসেছেন নিজেদের থালা নিয়ে। প্রসাদ এল শুধু মশলা দিয়ে মাখা কচুরমুখি সিদ্ধ আর নারকেল দিয়ে সাবুর পায়েস। অপূর্ব স্বাদ। আমরা দুজনে প্রসাদ খেলাম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। সন্ন্যাসীদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আজ একাদশী তিথি। তাই আশ্রমে অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ।

নৈমিষারণ্যের মন্দির

একটু বিশ্রামের পর গেলাম নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী কুমারব্রহ্মচারী স্বামী নারদানন্দ তীর্থের ঘরে। ছোট্ট ঘর। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। পুরনো আমলের সাধারণ চারপায়া একটা খাট। তার উপরে ভিখিরি ঘরের কাঁথা যেমন, তাই-ই পাতা একটা। নেতানো বালিশ। একটা নিচু পায়া ছোট খাটের উপরে বসে আছেন তিনি।

স্বামীজি এখন অসুস্থ। মাথায় জটা নেই। গায়ের রঙ বেশ ময়লা। ছোট ছোট চুল। শীর্ণ চেহারা। দেখলে মনেই হয় না সন্ন্যাসী। বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছেন সামনের দিকে। সন্ন্যাসী শিষ্যরা তাঁর সেবা করেন। তেমন হাঁটাচলা করতে পারেন না। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটু আগে প্রসাদ পেয়েছেন। স্বামীজির বয়েস ১৩০ বছর। আমি আর পুনম নিচে মেঝেতে বসলাম প্রণাম করে। আমাদের মুখের দিকে তাকালেন স্বামীজি। কোনও কথা বললেন না। এইভাবে বসে রইলাম প্রায় মিনিট পনেরো। আমিই প্রথমে কথা শুরু করলাম,

— বাবা, যদি অনুমতি দেন তো একটা কথা বলি।

সম্মতি দিলেন ঘাড় নেড়ে। মুখে হাসি নেই তবে গম্ভীরও নয়। প্রসন্ন মুখমণ্ডল। বললাম,

— আজ তো একাদশী ব্রতপালন হচ্ছে আশ্রমে। দয়া করে বলবেন, এই ব্রত পালন করা হয় কেন, এর ফলই বা কী?

কথাটা শুনে কোনও কথা বললেন না প্রায় মিনিট পাঁচেক। তারপর অতি ধীরে ধীরে একজন খুব অসুস্থ মানুষ যেভাবে, যে সুরে, যেমন করে কথা বলেন তেমন করেই বললেন,

— বেটা, দেহাদির বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন। আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— তিনিই আত্মা। মূল কথাটা হচ্ছে, আত্মিক উন্নতিকল্পে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত বা জয় করার জন্যেই করা হয় একাদশী ব্রতপালন।

একটু চুপ করে রইলেন। আমরা কোনও কথা বললাম না। অপেক্ষায় রইলাম পরের কথা শোনার জন্যে। মিনিটকয়েক পর বললেন,

— মানুষের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি, তিনিই হলেন একাদশী দেবী। দেবীর নাম অনুসারে হয়েছে তিথির নাম। একাদশী ব্রতপালনে একাদশ ইন্দ্রিয় সংযম হয়।

কথাটা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম,

— বাবা, একাদশ ইন্দ্রিয় বলতে?

স্বামী নারদানন্দ তীর্থ বললেন,

— বাচ্চা, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি— বাক্, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ। আর পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়— চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। এই দশটি ছাড়াও আছে আরও একটি— অন্তরিন্দ্রিয় মন। এই নিয়েই একাদশ ইন্দ্রিয়, যা দিয়ে গঠিত আমাদের পাঞ্চ ভৌতিক দেহ। আর রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ— এই পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়মাত্র। তবে মনের সবটাই কিন্তু ইন্দ্রিয় নয়। মনের যে অংশ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়াভিমুখী, তাই-ই ইন্দ্রিয় আবার অন্য দশ ইন্দ্রিয়ের কর্তাও। কিন্তু মনের যে অংশ বুদ্ধি বা মহত্ত্বের অভিমুখী, তাকে ইন্দ্রিয় বলা যাবে না। সেই অংশে চৈতন্যের প্রকাশ।

এই পর্যন্ত বলে থামতেই প্রশ্ন করলাম,

— একাদশী ব্রতপালনের নিয়মটা কী?

অতিবৃদ্ধ স্বামীজি একটু বিশ্রাম নিয়ে পরে বললেন,

— শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে ভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ। জল পর্যন্ত গ্রহণ করা চলবে না। তবে কলিযুগে উপবাস নিষিদ্ধ। তাই অন্ন ছাড়া আর যা কিছু নিরামিষ তা গ্রহণ করা চলে। অন্ন বলতে চাল, ডাল, আটা, ময়দা ও সুজিকে স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে অন্ন। এর কোনওটি গ্রহণ করলে একাদশী ব্রত ভঙ্গ হয়। কোনও ফল হয় না।

জিজ্ঞাসা করলাম,

— ফল বলতে?

আবার স্বামীজি বিশ্রাম নিলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন,

— সমস্ত তীর্থদর্শনে যে ফল, তা পাওয়া যায় নিরম্বু একাদশীর উপবাসে। সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয় শুধু একাদশী ব্রতপালনে। একাদশীদেবী প্রসন্ন হলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্যই সিদ্ধ হয় সহজে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে নারী-পুরুষ, কুমারী, সধবা, বিধবা এই ব্রতপালন করতে পারে সকলে।

— বাবা, একাদশীর দিন বাংলার ঘরে ঘরে প্রায়ই দেখি রুটি, লুচি, পরোটা খেতে। এতে কি তাদের কোনও কল্যাণ হয়?

কথাটা শুনে মুচকি হাসলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। এতক্ষণ পর

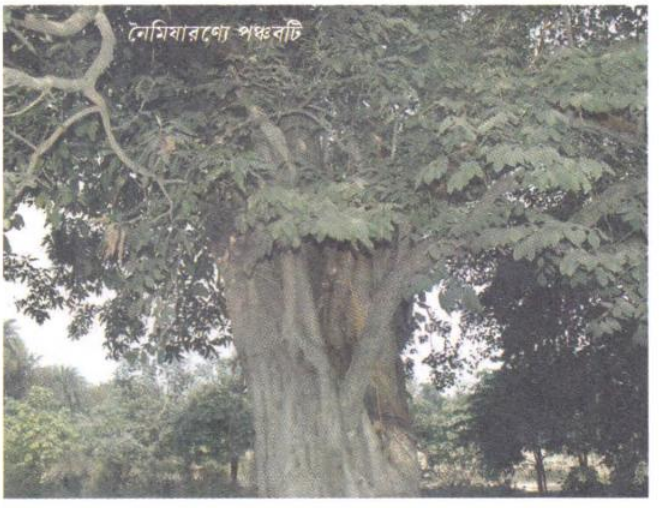
নৈমিষারণ্যে পঞ্চবটি

এবার আমাদের দুজনের পরিচয় জানতে চাইলেন স্বামীজি। পুনমের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থেকে শুরু করে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার কথা জানালাম। কথাগুলো শুনে বৃদ্ধ স্বামীজি মাথাটা হাল্কা দুলিয়ে হাসতে লাগলেন আপনমনে। এ হাসির রহস্যভেদ করতে পারলাম না। পুনম অবাক হয়ে শুনছে আমাদের কথা। চোখ-মুখের ভাবটা দেখে বুঝলাম, ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসী হলেও আমার পাল্লায় পড়ে ওর সাধুসঙ্গ হল এই প্রথম। এবার স্বামীজির হাসির কারণ আর মনে ওঠা একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে জিজ্ঞাসা করলাম,

— বাবা

হাতের ইশারায় কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন,

— মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই 'লেড়কি'র সঙ্গে তোর যোগাযোগটা কেন হল, কী জন্যে হল, তাই তো?

— হ্যাঁ বাবা, আপনি ঠিকই বলেছেন। এ প্রশ্নের কি কোনও উত্তর আছে?

সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী এবার পাশ থেকে একটা বালিশ টেনে রাখলেন কোলের মধ্যে। কনুই দুটো বালিশে ভর দিয়ে বললেন,

— বাচ্চা, আজ কয়েকদিন হল শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

বলে চুপ করে বসে রইলেন। বুঝলাম বিশ্রাম নিচ্ছেন। কথা বলে বিরক্ত করলাম না। চেয়ে রইলাম মুখের দিকে। তিনি বললেন,

— এই বিশ্বসংসারে যা কিছু ঘটছে, যা কিছু ঘটেছে আর যা কিছু ঘটবে জানবি, তার মধ্যে কোনও না কোনও কারণ একটা আছেই। তবে কিছু কারণের উত্তর আমরা খুঁজে পাই আর কিছুর পাই না। যেটার পাই না, জানবি সেটারও কোনও উত্তর আছে তবে পাই না।

আবার একটু বিশ্রাম নিলেন। আমরা দুজনে স্থির হয়েই বসে রইলাম। স্বামীজি বললেন,

— বেটা, জন্ম-জন্মান্তরের কোনও সম্পর্ক, পূর্বজীবনের কোনও যোগাযোগ সূত্র না থাকলে এ জীবনে কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ হওয়ার নয়। প্রতিদিন তুই যার সঙ্গে কথা বলছিস, যাকে দেখছিস, যার পাশে বসছিস, একেবারে সত্য জানবি, কোনও না কোনও জীবনে, কোনও না কোনও সম্পর্ক ছিলই। তবে তার মধ্যে কাউকে দেখলে যদি ভাল লাগে বুঝবি, তার সঙ্গে প্রীতির কোনও সম্পর্ক ছিল পূর্বজীবনে। আর কাউকে দেখলে ভাল না লাগলে, কথা বলতে প্রবৃত্তি না হলে বুঝবি, সম্পর্ক একটা ছিল তবে সেটা সুসম্পর্ক নয়। একথা শুধু তোর ক্ষেত্রে নয়, মানুষ, পশু-পাখি, জীবজগতে সকলের ক্ষেত্রেই সত্য। তবে এই যোগাযোগটা ঠিক ঠিক সময়ে নিয়মমাফিক প্রকৃতিই করিয়ে দেন তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

কথা বলছিলেন মাথা নিচু করে। এবার দুজনের দিকে একনজর দেখে নিলেন। পকেটে আমার বিড়ি আছে। ধরাতে ঠিক সাহস পেলাম না স্বামীজির বার্ধক্য ও পরিবেশের কথা ভেবে। একটু বিশ্রামের পর বললেন,

— এবার আসি তোদের কথায়। তোরা দুজনেই অপরিচিত দুজনের কাছে। তুই থাকিস পঞ্জাবে আর তুই কলকাতায়। হঠাৎ কেন এমন যোগাযোগটা হল? (পুনমকে লক্ষ্য করে) তোরই বা ওকে ভাল লাগল কেন? এত বিশ্বাসই বা করলি কেন? স্টেশনে তো অনেক লোকই ছিল, তাই না? বেটা মনে রাখিস, কার্য ও কারণ ভেদে প্রকৃতিরই এই যোগাযোগের খেলা। যেমন ধর হঠাৎ যোগাযোগে কারও কোনও ক্ষতি হল, বুঝতে হবে তার কোনও না কোনও জন্মে ঋণ ছিল, এবার তা শোধ হল। কিছু প্রাপ্তি হলে যার কাছ থেকে পেলি, সে ঋণমুক্ত হল।

আবার বিশ্রাম নিলেন। আমরা বসে রইলাম শান্তভাবে স্থির হয়ে। এবার মুখটা তুলে দুজনের দিকে একবার দেখে নিয়ে তিনি বললেন,

— তোদের সমস্ত কথা শুনে যা মনে হয়েছে, তাতে আমার জ্ঞানে বলে, তোদের মধ্যে এটা কোনও স্বার্থের যোগাযোগ নয়। সম্পূর্ণই মনের ও দর্শনের। কোনও না কোনও জন্মে তোদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, মা-সন্তান, ভাই-বোন, প্রেমিক-প্রেমিকা বা যে কোনও যোগাযোগে অত্যন্ত মধুর কোনও সম্পর্ক ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রকৃতির কোনও খেলায় সেই সম্পর্কে ছেদ পড়ে। মৃত্যুকালীন তীব্রভাবে কিছু কথা বলা বা দেখার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল, এমনও হতে পারে। আবার এও হতে পারে, ওই বিচ্ছেদের পরও উভয়ে উভয়কে কাছে পাওয়া, কথা বলা বা দেখার বাসনা চলেছিল তীব্রভাবে কিন্তু প্রকৃতির ইচ্ছায় তা পূরণ হয়নি। জন্মান্তরের সেই বাসনার সংস্কার সঙ্গে করে এনেছিস। প্রকৃতি তাঁর সময় মতো যোগাযোগ ঘটিয়ে তা আবার মিটিয়ে দিলেন। মিলনের কোনও বাসনা ছিল না, তা থাকলে যোগাযোগটা প্রকৃতি অন্যভাবে করিয়ে দিতেন। আরও একটা কথা আছে বেটা, এটা না ঘটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত প্রকৃতিও এতদিন তোদের কাছে ঋণী ছিলেন। যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিয়ে এবার তিনি নিজেও ঋণমুক্ত হলেন।

একথায় পুনম আমার, আমি তাকালাম পুনমের দিকে। কোনও কথা হল না। স্বামীজি অসুস্থ তাই আর বিরক্ত করলাম না। অতীতজীবন সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করতে মন চাইল না। এতক্ষণ যে দয়া করে এত কথা বলেছেন তার জন্য আমি ধন্য হলাম। এই কথাটুকুতেই কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। শেষ প্রশ্ন করলাম,

— ইতনা সাল বিত গয়া বাবা, লেকিন আপকা কুছ মিলা?

স্বামীজি চুপ করে রইলেন। এমন কথায় অবাক হলেন বোধ হল না। তবে লক্ষ করলাম, ভাবের কেমন যেন একটা পরিবর্তন হল মুখমণ্ডলে। ধীরে ধীরে যেন নেমে এল একটা পরম তৃপ্তির ভাব। এ ভাব পার্থিব কোনও বস্তুপ্রাপ্তির নয়। আমরা বসেই রইলাম কিন্তু কোনও উত্তর নেই। এইভাবে কেটে গেল পাক্কা সাতাশ মিনিট। এবার প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে স্বামীজি বললেন,

— বেটা, ইস জীবন মে মুঝকো মিলনে কা অউর কুছ বাকি নেহি।

শেষ প্রশ্নের শেষ কথাটা শুনলাম। আর কোনও কথা নয়। প্রণাম করলাম স্বামীজিকে। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। এই রাতটাও কাটল। ⌘⌘

আগামী সংখ্যায়

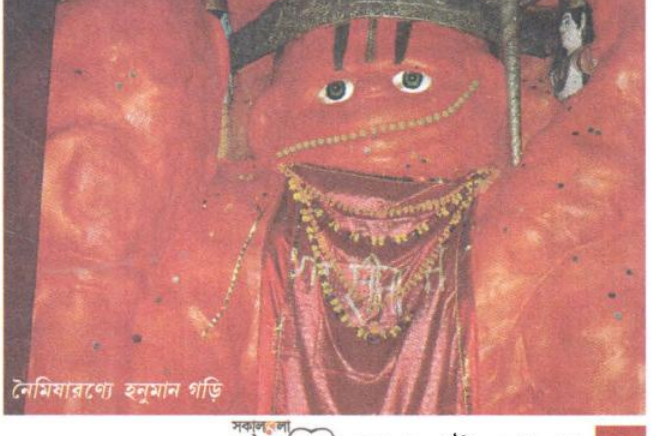
নৈমিষারণ্যে হনুমান গড়ি

উৎপল মানস

১৯ আগস্ট উৎপল দত্তের ১৯তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হল। অভিনয়ের সবক'টি মাধ্যমে যাঁর বিচরণ ছিল অত্যন্ত সাবলীল। তাছাড়া নানা বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ। বহুমুখী প্রতিভার এই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন অরূপ মুখোপাধ্যায়। 'উৎপল মানস'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল রবীন্দ্রসদনে। উপস্থিত ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, শোভা সেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। বইটি প্রকাশ করেছে দীপ প্রকাশন।

'ল্যান্ড অব দ্য ওয়েল'

এ বই বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়ে লেখা। মূলত মনস্তাত্ত্বিক রহস্যরোমাঞ্চধর্মী এক কিশোরের কাহিনি। সম্পূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ এটি। নিঃসঙ্গ, লাজুক এক কিশোরের জীবনের অবসাদগ্রস্ততাই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। কিশোরটি গোয়ায় বাবা-মার সঙ্গে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে পরিচিত হয় অন্য একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই সে নিজেকে বেমানান মনে করে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে ছেলেটি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে যায়। লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন বাস্তব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট-কে আশ্রয় করে তারা পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন লেখিকার বাবা ছন্দক চ্যাটার্জি। অক্সফোর্ড বুকস্টোরে। হার্পার কলিনস-এর সহযোগিতায় বইটি প্রকাশিত হল ইংরেজি ভাষায়।

কিছু বইপত্র

'আদম' থেকে জুলাই মাসে প্রকাশিত হল সুধীর দত্তের 'গদ্যসংগ্রহ' বইটি। বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ কিংবা জয় গোস্বামী– বিভিন্ন সময়ের কবিদের লেখার সমালোচনা করেছেন সুধীর দত্ত। প্রতিটা প্রবন্ধেই কবিতার উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। আসলে তিনি সময়কে ধরতে চেয়েছেন।

প্রফুল্ল রায়ের সব লেখাই পাঠকের মনোজগৎকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সাম্প্রতিক জ্বলন্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা 'বিস্ফোরণ' অবশ্যই অন্য এক বাস্তববাদী উপন্যাস। 'মুম্বই', বহুদিন ধরেই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। কোটি টাকা নয়ছয় হয়ে যায় এখানে– কে না জানে! কিন্তু প্রফুল্ল রায় তাঁর নায়ককে কর্মসূত্রে নিয়ে গেলেন মুম্বইতে। 'বিস্ফোরণ' ঘটল আর তখনই বেরিয়ে এল সন্ত্রাসবাদের আড়ালে আসল চেহারা। প্রফুল্ল রায়ের এ উপন্যাস সব ধরনের পাঠকের জন্য। দে'জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এ বই।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

মতি নন্দীর ছোটগল্পের জগৎ

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

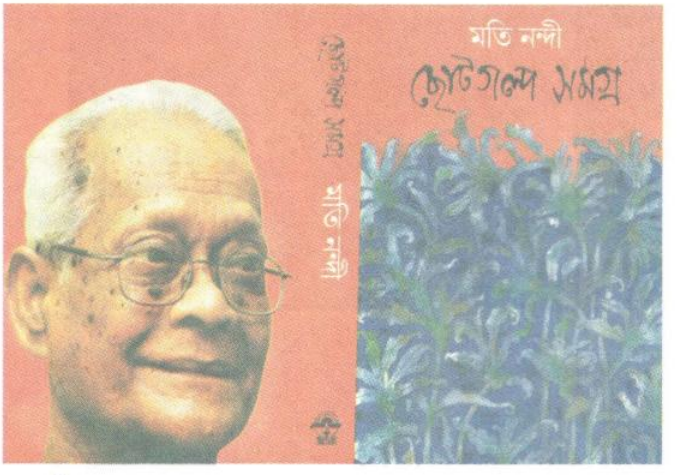

পাঁচশ পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার সুগঠিত সুমুদ্রিত বইটি হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মতো বাংলা ছোটগল্পের নিবেদিত-প্রাণ পাঠকের মন ভরে গেল। কারণ যাকে আজকাল পঞ্চাশের দশক বলা হয় অর্থাৎ ১৯৫০-এর দশকে যাঁরা বাংলা গল্প লিখতে শুরু করেন তাঁদের মধ্যে মতি নন্দীর শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না কারুর। অজস্র মণি-মুক্তোর মতো স্মরণীয় গল্প লিখেছেন তিনি, যাদের মধ্যে দিয়ে একদিকে গড়ের মাঠের ফুটবল ও ক্রিকেট, অন্যদিকে কলকাতার গলির রিক্ততা ও প্রাণপ্রাচুর্যকে বিশেষত প্রকাশিত হতে দেখেছি। হাতের কাছে সেই বৈভবকে পেয়ে যাওয়ায় কোনটা ছেড়ে কোন গল্পটা আগে পড়ব, তাই নিয়ে মনের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। প্রায় সব গল্পই পড়া। এবং এমনই তাদের রঙিন বৈচিত্র ও স্মরণযোগ্যতা যে, দেখছি কোনওটাই এতদিনেও মনের কোণে বিন্দুমাত্র মলিন হয়নি। তাই বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার আশ্চর্য বিস্ময় ও তার স্বাদ লেগে রইল গল্পগুলি পাঠের সময় ও তার পরে।

যেমন 'বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতা' গল্পটি। মতির আর পাঁচটা গল্পের মতো বিখ্যাত নয়। বাঘের কামড় বা গর্জন এখানে ততখানি স্পষ্ট নয়। ভবিষ্যতের সমালোচক হয়তো এটিকে তাঁর অপ্রধান গল্পের সারিতেই ফেলবেন। কিন্তু পড়লে এখনও মনে হয় বনের রাজা এই গল্পেও পৃষ্ঠাগুলির ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। প্রাক্তন ফুটবলার বিজন দত্তকে নিয়ে লেখা এই গল্প। বিজন খেলা ছাড়ার পর আজ স্যানাটোরিয়ামে শুয়ে আছে; কিন্তু এখনও সমান মেজাজি, দুর্মুখ, প্রতিবাদী ও বে-হিসেবি। বিজনকে পড়তে গিয়ে আমার বরাবর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেজাজ' গল্পটির কথা মনে পড়ে। তাঁর নায়কের নাম ভৈরব। মানিকবাবু গল্পের মধ্যেই প্রশ্ন করেছিলেন 'মেজাজের মতো এমন ফ্যাশনেবল দামী চিজ্ সে কোথা থেকে পেল? মানুষটা চাষা তাতে গরীব, তার মেজাজ হয় কিসে?' এই কেনর উত্তরই গোটা গল্পে ভৈরব নামক প্রোটাগনিস্ট চরিত্রের মেজাজের কাছে গুটিয়ে সংহত হয়ে বক্তব্য বিচ্ছুরণ করছে পাঠকের উদ্দেশে। অত্যাচারী সমাজ তথা পরিবেশের চাপে খাটো হয়ে, নীচু হয়ে, মাপসই হয়ে, মানানসই কথা আর ভদ্র ব্যবহারে আমরা ক্রমাগত মেকি, যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি। মানিকবাবুর ভৈরব আর মতিবাবুর বিজন যেন তার মূর্তিমান প্রতিবাদ। এই রুক্ষ কঠিন পুরুষ আদিমতা শীর্ষেন্দুর একটি উপন্যাসেও 'সনৎ' নামে এক চরিত্রে ডালপালা মেলেছিল।

এই সংকলনে অগ্রন্থিত 'ছাদ', নির্বাচিত গল্পের 'রাস্তা', 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু', 'বেহুলার ভেলা' গ্রন্থের নাম-গল্পটি, 'চতুর্থ সীমানা' গ্রন্থের 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান', 'কপিল নাচছে' গল্পগ্রন্থের 'শবাগার' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প আছে, — যাদের অনেকগুলিই রসবিচারে ভয়াবহ হয়েও শিল্প-উত্তীর্ণ। গল্পগুলিতে লেখকের আত্মবিশ্বাসের চাপা-হাসি যেন উপচে পড়েছে।

মতি নন্দীর কাহিনিতে বাজে-বক্‌বক্ বা গৌরচন্দ্রিকা থাকে না বললেই হয়। ছোটগল্পে

তো বাড়তি শব্দ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। ফলে গম্ভীর, সন্ত্রস্ত, আসন্ন বিপদ ও বিপর্যয়ের তাড়নায় তড়িদাহত, বেপরোয়া মনোভাবের পরিবেশ ও মানুষজনকে চট করে খুঁজে পান পাঠক। গল্পের শুরু ও সমাপ্তিতেও তার আভাস মিলবে। যেমন 'এ খেলার কৃতিত্ব আমার নয় কিন্তু, স্কোর-বুকে দেখবেন অন্য লোকের নাম লেখা আছে।' (শূণ্যে অন্তরীণ')। ''সারাপথ– ওদের পায়ের কাছে শাড়িঢাকা শিবু শোয়ানো ছিল'' ('একটি পিকনিকের অপমৃত্যু')। ''আর রিটায়ার করাতে পারবে না। রিজাইন দিয়ে এলুম।'' ('বয়সোচিত')। ''ভোররাতে সুমিত্রার গর্ভপাত ঘটল'' ('শুভাদ্বয়')। ''তখন আমি জানলাম, ও এবার মারা যাবে।'' ('বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতা')। মৃত্যুর খবর দিতে এসে ''আমি শিগগিরই বিয়ে করছি।'' ('দুর্ঘটনা')। ''মেজ জ্যেঠিমারা উঠে যাচ্ছে বস্তিতে'' ('চোরা ঢেউ')। ''নাড়ু তোর মা মরে গেছে'' ('তাপের শীর্ষে')। ''একদিন ভোর থেকে ইলাকে পাওয়া গেল না'' ('শীত')। ''কিন্তু তার আগে এই আরামচেয়ারে বসে চুরুটটা শেষ করতে করতে ভয়ঙ্কর একটা সন্ত্রাসের ছক নিজের জন্য রচনা করতে থাকবেন।'' ('ইমেজ')। ''বাজার থেকে বেরিয়ে ট্রামরাস্তা ধরে প্রবীর ষাট-সত্তর মিটার হেঁটেছে, তখনই ঘটল'' ('পর্দার নিচে একজোড়া পা')। ''শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুল বলল ''ও তো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের।'' ('শবাগার')। ''লোকটা মেয়েটাকে দু'হাতে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল। অন্ধকারে ও প্রথমে সেটা টের পায়নি। অ্যাসিড মারার পর লোকটাই প্রথম চেঁচিয়ে ওঠায় ও বুঝতে পারল মালটা কোথায় গিয়ে পড়েছে।'' ('গলিত সুখ')।

গল্পের এইসব শুরু আর শেষ যেন এক-একটা অপ্রত্যাশিত চপেটাঘাতের মতো। কাটা কাটা মন্তব্য, তিরের মতো উক্তি-প্রত্যুক্তি, মাঝখানে জমাট-কালো ভয়াবহ সমাজ ও সময়ের খণ্ডচিত্র। কিন্তু লেখক হিসেবে মতি নন্দী তান্ত্রিকের মতোই নৈর্ব্যক্তিক ও অকুতোভয়। ''মতির স্বভাবে ধরাধরি বস্তুটা বস্তুতই নেই। বয়সের তুলনায় একটু বয়স্ক সে, একটু গোঁয়ার। যে-মেজাজটা মেলে তাঁর লেখাতেও। ...স্যাঁতসেতে ব্যাপার একদম নেই। সর্বদাই খটখট করছে। ...মতি জ্যান্ত এবং কিকিং ...এদিক ওদিক দমাদ্দম লাথি ছুড়ছে। গনগনে উনুনটাকে টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দেওয়ার বোকামি করতে সাধ যাচ্ছে না।'' ('ভূমিকা', সন্তোষকুমার ঘোষ)।

এই বইয়ে অবশ্য তিন-তিনখানা ভূমিকা রয়েছে। একটির ভগ্নাংশ উদ্ধার করলাম। বাকি দুটির একটি. সম্পাদক মানস চক্রবর্তীর ('দ্বিতীয় সংস্করণ, অতএব')। আর প্রথমটি স্বয়ং লেখকের 'দ্বাদশ ব্যক্তি'। না না, এটি মতি নন্দীর কাহিনি নয়, ভূমিকা, যাতে বক্তব্য কম, গল্পই বেশি। তেরো পৃষ্ঠার এই ভূমিকাটি এবং সন্তোষকুমারের ভূমিকা, যাঁরা মতিকে নিয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের পক্ষে উপকারী। তবে প্রশ্ন হল বইটিকে সাজানো নিয়ে। বই খুলে পাঠক সূচিপত্র পাবেন না, ওটি মিলবে 'দ্বাদশ ব্যক্তি' ও 'দ্বিতীয় সংস্করণ অতএব'- এর পর। এর পর তিনটি গল্প। তার পর সন্তোষবাবুর ভূমিকা। পাঠক একটু হোঁচট খেতেই পারেন। সূচীর পরে তিনটি ভূমিকা, তার পর এক-একটি গ্রন্থ ও তার গল্প সাজালেই ভাল হত। আর, মতি নন্দীর সব গল্প কি এই গ্রন্থে আছে?

ছোটগল্প সমগ্র। মতি নন্দী। দীপ প্রকাশন। ৩২৫ টাকা।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বইটি এস বলরামের লেখা। ভাষান্তর ও সম্পাদনা করেছেন সোমশংকর রায়। প্রচ্ছদ ও ভেতরের নানান যন্ত্রের ছবিও এঁকেছেন তিনি। সমগ্র বইটি নির্মেদ, তত্ত্বসহুল এবং শেষ পর্যন্ত একটি অভিমুখের দিকে এগিয়ে চলে। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় ডিজাইন-এর প্রয়োগ শুরু। কিন্তু ডিজাইন এবং ডিজাইনাররা কতটা প্রাসঙ্গিক গ্রাম্যজীবনে। মূলত ভারতবর্ষের ডিজাইন ও ডিজাইনারদের নানা আলোচনা এসেছে বইটিতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল নিম্নবিত্তের কাছে আজও অধরা। এখন ডিজাইনাররা বিক্রি হয় বহুজাতিক সংস্থার হাতে। কিন্তু কেন এর সমাধান করতে গিয়ে লেখক রাজনীতির অঙ্গনে ডিজাইনারদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন? সব মিলিয়ে বইটি ডিজাইনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য থেকে বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ডিজাইন। উপনিবেশের রীতি ও রাষ্ট্রের নীতি
এস বলরাম। মনফকিরা।
দাম : ৫০ টাকা।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য এই কবি প্রতিভার ব্যাপ্তি চিরকাল পল্লিগ্রামের ভেতরেই ছিল। এই সংকলন নতুন করে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে আজকের প্রজন্মের পাঠকদের। এক সময় কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে একই পংক্তিতে লেখা হত যতীন্দ্রপ্রসাদের নাম। পল্লিগ্রাম, সমাজের নানা কুপ্রথা, প্রেম সবই এসেছে তাঁর কবিতায়। লিখেছেন বেশকিছু প্যারোডি গান। তাঁর মনের মন্ত্র ছিল 'বিশ্ব সংসার চলছে ছন্দে', 'সৃষ্টি ভরপুর ছন্দস্পন্দে!' তাই তিনি পৃথিবীর নানা দেশের ছন্দ নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। হারিয়ে যাওয়া কবির কবিতা নতুন করে নবীন কবি ও কাব্যপ্রেমী মানুষের মনে নিশ্চিত প্রেরণার সঞ্চার করবে।'

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পাদনা : আশুতোষ ভট্টাচার্য
কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মারক সমিতি। দাম : ১২৫ টাকা।

ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা কে? বিতর্ককে ছাপিয়ে সকলেই এখন বলবেন একটিই নাম সচিন তেন্ডুলকর। শতরানের সংখ্যাটিই যাঁর ব্যাটিং স্কোর। তাই তিনি নির্দ্বিধায় শতরানের সম্রাট। অতিমানবীয় কীর্তিই বটে। ১৯৮৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রথম একদিনের ম্যাচের স্কোর ছিল শূন্য। প্রথম টেস্ট শতরান আসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। কিন্তু এসব তথ্য এখন সকলেরই জানা। সচিন তেন্ডুলকরকে নিয়ে লেখা বই-এর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এরই মাঝে শুভজিৎ ভট্টাচার্যের বই-এর উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রতিটা শতরান নিয়ে নানা তথ্য সংকলন। অর্থাৎ শতরানের পরই বিশেষ বিশেষ ক্রিকেট ব্যক্তিত্বদের লেখা নানা বিশ্লেষণ বইটিকে একটু আলাদা করেছে। প্রতিটি শতরানই উল্লেখযোগ্য হয়ে দেখা দিয়েছে লেখার মুনশিয়ানায়। সঙ্গে রয়েছে রঙিন ফোটোগ্রাফ। তবে সচিনের মতো ক্রিকেট মহীরুহকে নিয়ে এত লেখালেখি চলছে এ বই তাতে নতুনত্ব আনতে পারে কি না সেটাই এখন দেখার।

সেঞ্চুরির সম্রাট। শুভজিৎ ভট্টাচার্য।
আনন্দশক্তি প্রকাশন। দাম। ১৩০ টাকা।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

ছবি- শুভাশিষ সাহা

মল্লার শিল্পে বর্ষার পূর্বাভাস

দীপঙ্কর রায়

শ্রাবণের শেষেও পর্যাপ্ত ও ভারী বৃষ্টির অভাবে দক্ষিণবঙ্গ যখন ভ্যাপসা গরমে ক্লান্ত ও অস্থির তখন শহরের বুকে বর্ষার পূর্বাভাস পাওয়া গেল। 'মল্লার' শীর্ষক শিল্পকলার একটি যৌথ প্রদর্শনীতে শিল্পীরা বর্ষার রাগ বা সুরের পূর্বাভাস দিলেন। মল্লার শিরোনামে প্রদর্শনী হলেও শিল্পীরা যে যার মতো স্বতন্ত্র কাজের মাধ্যমেই নিজের নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। এককথায় টুকরো টুকরো পাঁচটি রঙিন মেঘের সমাহার এই মল্লার।

৮ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট ২০১২, অ্যাকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এর নর্থ গ্যালারিতে তন্ময় মৃধা, ধনঞ্জয় ঘোষ, চন্দন দাস, শুভাশিস সাহা ও দেবাশিস ঘোষ— এই পাঁচজন শিল্পীর ছবি ও ভাস্কর্যের যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। পাঁচজনই মূলত কলকাতার বিভিন্ন আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে নিয়মিত শিল্পকলার চর্চা করে চলেছেন। প্রদর্শনীর একমাত্র ভাস্কর হলেন চন্দন দাস। সব ক'টিই ছোট সাইজের ফিগারেটিভ ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যগুলিতে শ্রী দাস এক অনাবিল আনন্দের উৎস ও তার প্রকাশকে ধরতে চেয়েছেন। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির যে সরল ফর্ম, তার ভাব ও অভিব্যক্তিকেই শ্রী দাস তুলে ধরেছেন। বিশেষভাবে বলা যায় স্বাধীনোত্তর ভারতের আধুনিক শিল্পকলার যে সরল ও সমন্বিত রূপকল্প ভারতীয় ভাস্কররা আত্মস্থ করেছেন তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমি শিল্পকলার মেলবন্ধনের এক রূপকথা পাওয়া যায় শ্রী দাসের ভাস্কর্যগুলিতে। তন্ময় মৃধা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী বা ভাবগত এক রূপক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ছবিগুলিতে। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও ভোগবাদী অস্থিরতা কখনও কখনও মানুষের মনের প্রাকৃতিকতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে ক্ষয়িষ্ণু করলেও নতুন নতুন রূপে আবেগ ও চেতনার জন্ম নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের সেই সব খণ্ড চিত্রগুলিকেই শ্রী মৃধা সাজিয়েছেন তাঁর মিশ্র মাধ্যমের কাজে। ধনঞ্জয় ঘোষের তেল রঙে আঁকা ছবিগুলি মূলত তাঁর দৈনন্দিন জীবনে দেখা-চেনা বাস্তব রূপের প্রতিচ্ছবি। বিষয়ের গভীরতায় না গিয়ে শহর কলকাতার ক্রাইসিস চিত্র 'দশ ফুট বাই দশ ফুট'- কাহিনিকেই ক্যানভাসের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। দেবাশিস ঘোষ তেল রঙের মাধ্যমে ক্যানভাসের উপর বিগত তিন দশক ধরে চর্চা করে চলেছেন। মানুষের মুখাবয়বের অভিব্যক্তিই তাঁর ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে। নির্জনতা, একাকিত্ব ও তার ভিতরকার হ্যালুসিনেশন বা ভয়মিশ্রিত মায়া— এই নিয়েই চিত্রপটকে সাজিয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে। শুভাশিস সাহার অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে করা ড্রয়িং ও বেশ বড় সাইজের কয়েকটি পেইন্টিং-এর রেখা বিন্যাস, বুনোট, ফর্ম ও ছন্দোবদ্ধ বর্ণের ব্যবহার জানিয়ে দেয় তিনি করণ-কৌশলগত বেশ দক্ষ।

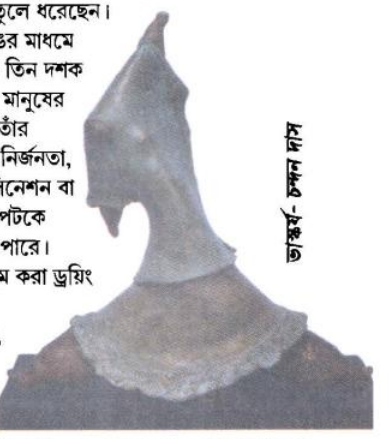

ভাস্কর্য- চন্দন দাস

মূলত এক সিটিং-এ করা ফিগার গ্রাউন্ড রিলেশনের শাস্ত্রগত পশ্চিমি বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের ধারা তাঁর কাজগুলিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

সমগ্র প্রদর্শনীর উপস্থাপনা ও ডিসপ্লে বেশ পরিচ্ছন্ন। সবশেষে বলা যায়— সব মেঘে বৃষ্টি হয় না, তাই কোন মেঘ মেঘমল্লারের সুর সৃষ্টি করবে ও বর্ষার সূচনা করবে তা আগামীদিনের আরও অনেক প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখতে পাব।

লিটল ম্যাগাজিন

আজ থেকে দুশো বছর আগে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংবাদ জগতে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবে তাদের রাজত্ব কায়েম করেছে। নীলচাষিদের উপর চলছে নির্মম অত্যাচার। অন্যদিকে, রামমোহনের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছে। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন। বিধবাবিবাহের প্রচলন ঘটাতে ব্যস্ত তিনি। ঠিক এই রকম এক যুগসন্ধিক্ষণে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। সহজ সরল ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি কখনও ইংরেজদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, কখনও বা সমাজ সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য এবং এর জন্যেই তৎকালীন সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠা। এহেন একজন কবির জন্মদ্বিশতবর্ষে 'কবিতা সীমান্ত' তাদের সাম্প্রতিক সংখ্যায় একটিমাত্র প্রবন্ধেই (ব্যাপ্ত চরাচর নারায়ণপ্রসাদ সেনগুপ্ত) তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দায় সেরেছেন।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখাগুলির মধ্যে রয়েছে শতবর্ষের আলোকে আলোকিত উর্দু সাহিত্যিক ফৈজ আহমেদ ফৈজ-কে নিয়ে জ্যোতির্ময় দাশের প্রবন্ধ। ব্রেখ্‌ট ও গুন্টার গ্রাসের কবিতার বাংলা অনুবাদ, অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সন্তোষকুমার ব্রহ্ম। রয়েছে কৃষ্ণ ধর, শান্তি সিংহ প্রমুখের কবিতা।

কবিতা সীমান্ত। সম্পাদক : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন রায়। বাড়ি: এ/৬, ঘর: ১০৩, প্রসাদনগর, ২৭ বিটি রোড (কামারহাটি) কলকাতা - ৫৮।

রামানন্দের শিষ্য কবির বলে গেছেন 'মন্দিরে-মসজিদে যদি ভগবানকে খোঁজো তবে ঝগড়া মিটবে না। তিনি সবার অন্তরে। সব মানবদেহের মধ্যেই ঈশ্বরকে পেলে সব বিরোধের নিষ্পত্তি।' আর লালন ফকির আত্মস্থ করেছিলেন আরেক মহোজ্জ্বল মানব প্রকাশকে, তিনি শ্রীচৈতন্যদেব। আবার নজরুল লিখেছেন, 'এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন/বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদীনা, কাবা-ভবন.../' বলতে গেলে 'প্লাবন'-এর এবারের সংখ্যায় অপূর্ব করের লেখা 'বাউলগানে মানবধর্ম' প্রবন্ধটি সত্যিই চমৎকার। এবং খুবই মূল্যবান রচনা যা পাঠককে গভীরভাবে ভাবাবে। একই সঙ্গে তপন রায়চৌধুরির 'রবীন্দ্রকাব্যে দুই পর্ব' ও জনেশ ('জনেশ' না 'জ্ঞানেশ'?) ভট্টাচার্যের 'মানসিক অবসাদ ও মুক্তির আলো' প্রবন্ধ দুটিও উল্লেখ করার মতো।

প্লাবন। সম্পাদক : স্বপন দত্ত। ১৪৩/৫ নীলাচল, পো : নীলাচল, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৪। ⌘⌘

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

Ori-Plast®

সারা জীবনের সাথী

CPVC • uPVC • HDPE • SWR

পাইপস এবং ফিটিংস ও **Heavy Duty**

জলের ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারক

REGISTERED OFFICE : 40 Strand Road, Kolkata-700 001 Phs. : (033) 2243 3396 / 97 Fax : (033) 2243 2395
CORPORATE OFFICE : 9A, Wood Street, Kolkata-700 016 Phs. : (033) 2283 9054-58 Fax : (033) 2283 9059

প্রচ্ছদ কাহিনি

উত্তমকুমার

কোনও কোনও মানুষের মৃত্যু হয় না। কারণ তাঁদের বেঁচে থাকাটা এতটাই উদ্দাম এবং নাছোড় হয় যে মৃত্যুও সেখানে ম্লান হয়ে যায়। উত্তমকুমার ছিলেন সেরকমই একজন মানুষ। তাঁর মৃত্যুর তিনদশক পর আজও বাঙালি তাদের পরম প্রিয় মহানায়কের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেনি। বাঙালি আজও ভুলতে পারেনি উত্তমের সেই ভুবন ভোলানো হাসি। প্রয়াণের এতদিন পরেও উত্তমকুমারের স্মৃতি বাঙালির মন-মনন-মগজে এমনই জীবন্ত হয়ে আছে যে তাঁর মৃত্যুদিনটিকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে প্রতিদিনই তাঁর জন্মদিন হোক। উত্তমকুমারের জন্মদিনে (৩ সেপ্টেম্বর) মহানায়কের জীবনের সন্ধিক্ষণের নানা অজানা কাহিনি শুনিয়েছেন **আশিসতরু মুখোপাধ্যায়**, উত্তমের নৃত্যশিক্ষক **বব দাস** এবং **সমীরকুমার ঘোষ**

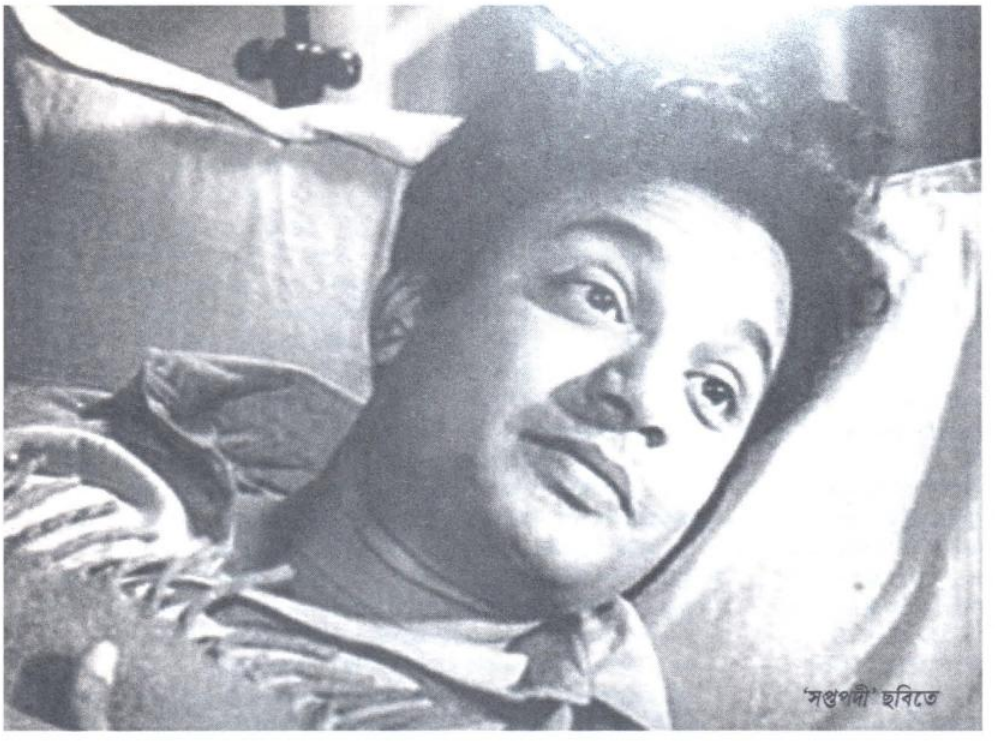

'সপ্তপদী' ছবিতে

এই পথ যদি না শেষ হয়...

আশিসতরু মুখোপাধ্যায়

পর্দায় কতজনের সঙ্গে কতভাবে প্রেম। কতরকমের ছলাকলা। কত রোমান্টিকভাবে, এক বুক আকুতি নিয়ে প্রেম নিবেদন। আর তাই দেখে দিনে-রাতে গালে হাত দিয়ে বসে শুধু 'উত্তম-স্বপ্ন'-এ বিভোর ষোলো থেকে ছেষট্টির বাঙালিনি।

ছেলেরাও কমতি নেই। মানাক চাই না মানাক চুলে সিঙাড়া থুড়ি 'ইউকে' কাট। বেসুরো, বেতালা গলায় চলনসই মেয়ে দেখলেই গুনগুনিয়ে ওঠা — 'এই পথ যদি না শেষ হয়... তুমিই বলো'। যদি মেয়েটির মুখে চিলতে হাসি ফুটে উঠল তো তাকে পায় কে? নিজেই চলতি-ফিরতি 'সপ্তপদী'-র নায়ক।

এভাবেই উত্তম মানেই প্রেম, রোম্যান্স, ভালবাসায় মাখামাখি। পশ্চিমবাংলার বুকে আক্ষরিক অর্থে টসটসে প্রেমের ভরা বাণ ডাকিয়ে ছেড়েছিলেন। তাঁর প্রেমের গল্প একটু শোনা যাক,—

উত্তমের প্রেম আঠারো বছর বয়সেই। '৪৪-এ। পোর্ট কমিশনার্সে চাকরি করতেন কেরানির। মাইনে পেতেন ২৭৫ টাকা। এক ছুটির দিনে গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে জ্যাঠতুতো বোন অন্নপূর্ণার সুশ্রী বান্ধবীকে দেখে উত্তমের (তখন তিনি অরুণ) ভালবাসার প্রথম শিহরণ। প্রেমিকার নাম গৌরী। গৌরীরানি গাঙ্গুলি।একদিন বাড়িতে আবার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এল প্রেমিকা। একপলকের একটু দেখায় কি আশ মেটে?

তাই গৌরীর সব জেনে নেয় অরুণ। থাকে ল্যান্সডাউন রোডের কাছে। গান শিখছে। রাজবালা গানের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে চলে প্রেমালাপ। অরুণ নিজেও গান শেখে, উচ্চাঙ্গসংগীত। তার ধারণা, গানে জ্ঞান না থাকলে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। গানের পাশাপাশি চলছে অভিনয় চর্চা। শেষে একসময় প্রেম থেকে পরিণয়। অরুণের সঙ্গে গৌরীর। ১৯৪৮-এর ১ জুন। ফুলশয্যার রাতে অরুণ গাইল সারা রাত। গানের শেষে গৌরীকে অরুণ বলল, 'বাড়িতে আমার বাবা-মা আর ভাইয়েরা আছে। সবাইকে ভালবাসবে। তুমি বড়লোকের মেয়ে। কষ্ট হলেও মুখে তা প্রকাশ করবে না।'

এই প্রসঙ্গে গৌরী-অরুণের ভালবাসার নাম চুপি চুপি বলে দিই। গৌরীকে অরুণ ডাকত 'গজু' বলে। আর গৌরী 'বণিক'। অরুণ থেকে উত্তমকুমার হয়ে ওঠার গল্প অনেকেরই জানা। স্টার থেকে সুপারস্টার হতে লেগেছে সুদীর্ঘ সময়। তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তোলার পিছনে ছিল তাঁর একাগ্র অধ্যবসায়। অক্লান্ত পরিশ্রম। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। আর একনিষ্ঠ সাধনা।

সেই সব মহৎ গুণের জন্যই উত্তম সর্বোত্তম। নায়ক থেকে মহানায়ক। উত্তমকুমারের নিজস্ব স্মার্ট চালচলন, বাচন, ভুবনভোলানো হাসি, ভাবভঙ্গি, পোশাক-আশাক আর হেয়ার স্টাইল মিলিয়ে যে টোটাল রোম্যান্টিতার পূর্ণতা, তা সর্বকালের এক উজ্জ্বল নজির।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, উত্তমকুমার স্টার না সুপারস্টার? তাহলে বলব, উত্তম প্রথমে স্টার। পরে অ্যাক্টর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রেট অ্যাক্টর হয়ে ওঠার মুহূর্তে আমরা তাঁকে হারালাম। তাঁর হঠাৎ মহাপ্রয়াণ ঘটল '৮০-র ২৪ জুলাই। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে (জন্ম : ১৯২৬-এর ৩ সেপ্টেম্বর)। মহানায়কের পুণ্য ৮৬ বছরের জন্মদিনে স্মরণ করি তাঁকে। অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশি চলচ্চিত্র-সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত থাকায় খুব কাছে থেকে উত্তমকুমারকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। জিরো থেকে হিরো হওয়ার এমন বিরল দৃষ্টান্ত ভারতে কেন, বিশ্বচলচ্চিত্রে আর আছে কি না জানা নেই। সবথেকে বড় বিস্ময়, মহানায়কের তিরোধানের সুদীর্ঘ বছর পরেও তাঁর উচ্চতায় পৌঁছতে দেখতে পেলাম না কাউকেই। ভবিষ্যতেও পাব কি না জানি না। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ উত্তমকুমারকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

একবার উত্তম বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন গাড়িতে। পথে মালগাড়ি পাস করবে বলে লেভেল ক্রসিংয়ে থামতে হল। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছেন দেখে কয়েকজন মেয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 'দ্যাখ লোকটা ঠিক উত্তমকুমারের মতো দেখতে।'পাশের আর একজন বান্ধবী বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হল নাকি? এখানে উত্তম আসবে কী করে!' মেয়েদের কথা শুনে মহাবিপদে পড়লেন উত্তমকুমার। আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে গাড়িতে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে বসলেন। শেষে মালগাড়িটা পাস করার পর গাড়ি স্টার্ট নিতেই তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আপনারা ঠিকই দেখেছেন, আমিই উত্তমকুমার।'

চায়ের ভাঁড় ফেলে মেয়েরা হইহই করে সদলবলে ছুটে আসতেই উত্তম তাঁর ভুবন ভোলানো হাসিতে বললেন, 'আপনারা ঠিকই চিনেছেন। টা টা, বাই বাই।'

উত্তমকুমারের ফুলশয্যার রাতে আড়ি পেতেছেন তাঁর দুই বউদি। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবল গরমের মধ্যেও তাঁরা একটা বড় ট্রাংকের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। সেটা দেখতে পেয়ে ওঁদের হাত ধরে বের করে এনে উত্তম বললেন, 'তোমরা পারও বটে! এই গরমের মধ্যে কী কষ্টই না করলে। শোনো, তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। আমি জানলা-দরজা খুলেই শোব।'

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি, উত্তমকুমারের 'অগ্নিপরীক্ষা', 'শাপমোচন', 'সাগরিকা', 'সবার উপরে' ইত্যাদি ছবিগুলি সুপার-ডুপার হিট। মেয়েদের কাছে তিনি স্বপ্নের নায়ক! রাজকুমার! ওই সময়ে একদিন উত্তম নিচের উঠোনে বসে খালি গায়ে শর্টস পরে স্নান করছিলেন। গৌরী দেবী বসে রয়েছেন সামনে। হঠাৎ কয়েকজন কলেজের মেয়ে সোজা বাড়ির ভিতরে ঢুকে এসে উত্তমকে চিনতে না পেরে গৌরী দেবীকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা— উত্তমকুমার কি এই বাড়িতে থাকেন?' 'হ্যাঁ' বলেই উত্তম গৌরী দেবীকে দেখিয়ে ওদের বললেন, 'উনিই উত্তমকুমারের স্ত্রী। ওঁর সঙ্গে কথা

বলুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।'

কোনওরকমে নিজেকে টাওয়েলে ঢেকে উত্তম পালিয়ে বাঁচলেন। ওদের তখন গৌরী দেবী বললেন, 'একটু আগে তোমরা যাঁর সঙ্গে কথা বললে, তিনিইতো উত্তমকুমার।' মেয়েরা হতবাক! অবাক!

হাজতবাসও একবার করেছিলেন উত্তমকুমার। নতুন গাড়ি কিনে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন গঙ্গার ঘাটে। সন্ধেবেলায়। তখন সবে গাড়ি চালানো শিখেছেন। গৌরীকেও গাড়ি চালানো শেখাতে গিয়ে রাস্তার ধারে এক ফেরিওয়ালাকে ধাক্কা মেরে দেওয়ায় পুলিশ এসে হাজির। ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় পুলিশ ওঁদের হেস্টিংস থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পুরে দেয় লক-আপে। সারারাত থানায় কাটানোর পর উত্তমকুমারের এক বন্ধু এসে সকালবেলায় জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। ভাগ্যিস তখন তিনি সুপারস্টার হয়ে যাননি।

গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে বরাবর লক্ষ্মীপুজো হত বড় ধুমধাম করে। পুজোর পর রাতে প্রোজেক্টর মেশিন আনিয়ে উত্তমকুমারের দুটি ছবি দেখানো হত। ঠাকুরদালানে সবার সঙ্গে শতরঞ্জিতে বসে ছবি দেখতেন উত্তমও। যদি কেউ তাঁর অভিনয় দেখে সিটি মারত, একটু গম্ভীর হয়ে উত্তম বলতেন, 'কে রে সিটি দিলি?' কথাটা বলেই আবার নিজেই হাততালি দিয়ে বলে উঠতেন, 'জিও গুরু জিও। চালিয়ে যাও।'

উত্তমকুমারকে প্রথম চাক্ষুস দেখি পঞ্চাশের দশকে। সিনেমা-সাহিত্যের মাসিক পত্রিকা 'উল্টোরথ'-এর বার্ষিক ঘরোয়া প্রীতি সম্মেলনের অনুষ্ঠানে। সাহিত্যিকদের প্রীতিভোজে আমন্ত্রণ জানানো হত। উত্তমও আসতেন প্রীতিভোজে। উল্টোরথের কর্ণধার প্রসাদ সিংহর কৈলাস বসু স্ট্রিটের শ্বশুরবাড়িতে আসর বসত।

সেবার উত্তম আর গৌরী দেবীর জন্য আলাদা চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে বসলেন না। আমাদের সঙ্গে পাত পেড়ে মেঝেয় খেতে বসে গেলেন। খাওয়ার পর গান শোনানোর আব্দার করলে উত্তমকুমার হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইলেন তাঁর প্রিয় দুটি রবীন্দ্রসংগীত 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' আর 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।' যাঁরা উত্তমকুমারের গান শুনেছেন তাঁরা জানেন তিনি কত ভাল গাইতেন।

১৯৬৪-র কথা। আমি তখন পাক্ষিক সিনেমা পত্রিকা 'রূপম'-এর সহযোগী সম্পাদক। পরিচালক তপন সিংহর 'জতুগৃহ' সবে মুক্তি পেয়েছে। ওই ছবিতে নায়ক হিসেবে ১০০টি ছবি পূর্ণ করেছেন উত্তমকুমার। আমিই প্রথম খবরটি স্কুপ করি। ম্যাগাজিনটা নিয়ে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওয় গেলাম তাঁকে দেখাতে। খবরটি দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, 'আমি নিজেও জানি না হিরো হয়ে কবে সেঞ্চুরি করলাম!' বললাম তাঁকে, শত ছবির শত নায়ক হিসেবে একটা বড় গোছের অনুষ্ঠান করুন না। আমরা আনন্দ করি। কথাটি শুনে মনে হল দমে গেলেন উত্তমদা। বললেন, 'আমারই কি ইচ্ছে করছে না, একটা বড় করে কিছু করি। কিন্তু আমার যে হাত-পা বাঁধা। 'ছোটি সি মুলাকাৎ' করতে গিয়ে দেনায় ডুবে আছি। আর্থিক সংগতি নেই সেলিব্রেট করার।' উত্তমকুমারের মর্মবেদনাটি উপলব্ধি করতে পেরে খুব দুঃখ হল। মনে মনে ভাবলাম, কথাটি না বললেই হয়তো ভাল হত। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল তখন।

একদিন ছুটির দিনে সকালে দেখা করতে গেছি তাঁর সঙ্গে ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে। কোনও শ্যুটিং ছিল না সেদিন। উত্তমদার পাশেই বসেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। নেলকাটার দিয়ে হাতের আর পায়ের নখ কেটে দিচ্ছিলেন দাদার। এমন একান্তে পাব ভাবিনি। স্টুডিওতে শ্যুটিংয়ের সময় উত্তমকুমার আর ঘরের উত্তমদার মধ্যে কত তফাৎ। টেপে রবীন্দ্রসংগীত শুনছিলেন তন্ময় হয়ে। আমাকে দেখেই টেপটি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'আরে! এসো, এসো— ভিতরে এসো। বসো।' একটু ইতস্তত করে উত্তমদার পাশে গিয়ে বসলাম। তাঁর পরনে ছিল কলিদার সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি আর পায়জামা। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, ভাল অভিনেতা হতে গেলে কী করা দরকার?

তিনি বললেন, 'সবার আগে চাই কষ্টস্বীকার। তারপর একাগ্রতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় আর সাধনা। শরীর সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। আর মনে ভাবতে হবে কী করে আরও ভাল অভিনেতা হওয়া যায়। অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষকে স্টাডি করতে হবে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতাকে তুলে ধরতে পারলে বড় অভিনেতা হওয়ার কোনও বাধা থাকে না। বললেন , জানোতো নায়ক হিসেবে প্রথম আমার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিকাশ রায় আর অসিতবরণ। অভিনয়ে এঁদের ছাড়িয়ে যেতে হবে এমনই একটা চ্যালেঞ্জ ছিল মনে মনে। সত্যি বলতে কী, এঁদের পর চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো কোনও শিল্পী পাইনি। প্রায় ফাঁকা মাঠেই গোল করতে হচ্ছে।

বেলা গড়াচ্ছে উত্তম কথার। একসময় আমাদের কথার মাঝখানে উঠে গেলেন সুপ্রিয়া দেবী। তখন উত্তমকুমার আর আমি মুখোমুখি। একমুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি বসে আছি মহানায়কের সামনে। তিনি যে সুপারস্টার কখনওই বুঝতে দেননি। শিশুর মতোই সরল। সাদাসিধে। আলাপনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নেই। মনে হল, নিজের দাদার সঙ্গেই কথা বলছি।

ষাটের দশকের ঘটনা। টেকনিশিয়ান'স স্টুডিওতে শ্যুটিং করছিলেন। ফ্লোরে ঢুকতেই দেখি, সেটের সামনে সোজাসুজি তাকিয়ে আছেন শূন্য দৃষ্টি মেলে। চোখাচোখি হতেই সামনে গিয়ে হাত নেড়ে উইশ করলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। আমাকে চিনতেই পারলেন না উত্তমদা। বললেন না কোনও কথাও। নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে গেলাম। দুঃখ আর অভিমান নিয়ে নীরবে বেরিয়ে এলাম সেট থেকে। এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন এড়িয়ে চললাম উত্তমকুমারকে। নিয়মিত শ্যুটিং কভারেজ-এ যাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার আগেই নিজেকে আড়াল করে চলে আসি। আমার এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ধরতে পেরে একদিন উত্তমকুমার নিজেই আমাকে ডেকে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? অনেকদিন ধরে দেখছি তুমি আমায় এড়িয়ে যাচ্ছ, কী হয়েছে?' আমি প্রথমে কিছু বলতে চাইনি। কিন্তু তিনি নাছোড়। শেষে বলতেই হল সেদিনের সেই দুঃখজনক ঘটনাটির কথা। সব শুনে তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে এনে একান্তভাবেই বললেন, 'সে কী! আমি তো তোমাকে সেদিন সেটে দেখেইনি। আসলে চরিত্রের কথাই ভাবছিলাম। হয়তো তোমার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। আমার দৃষ্টি তখন চরিত্রের গভীরে। আমি যখনই কোনও চরিত্রে অভিনয় করি, তখন আর নিজের কোনও হুঁশ থাকে না। ছবির চরিত্রই তখন আমার ধ্যান-জ্ঞান সব। চরিত্রটা ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। এটাই আমার অ্যাকটিং স্টাইল। সেটে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ আমি আর উত্তমকুমার নই। এক একটা ছবিতে হয়ে যাই সেই চরিত্রের মানুষ। তুমি তো আমায় দেখছ বহুকাল ধরেই। সেটের বাইরে যখনই দেখা হয়েছে, আমি কি তোমায় না-চেনার ভান করেছি? কিছু মনে কোরো না ভাই। আমি ইচ্ছে করে তোমায় সেদিন নেগলেক্ট করিনি।'

আর একটি ঘটনার কথা বলি।' ৬২ সাল। পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় প্রচণ্ড বন্যায় ভেসে গেছে ঘর-বাড়ি। অন্ন নেই। বস্ত্র নেই। চারিদিকে বন্যানিপীড়িত মানুষের হাহাকার। সেই ভয়াবহ বন্যাত্রাণে নামার ঠিক হল বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পীদের পথ-পরিক্রমায়। মহানায়ক উত্তমকুমার তখন অসুস্থ। তাই তাঁকে সঙ্গে নেওয়া হবে না বলে স্থির হল।

বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহের কথাটি উত্তমকুমারের কানে যেতেই তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা কী? সবাই মিলে আমাকে একঘরে করতে চাইছে। তা হবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবই।' শেষে কীভাবে মহানায়ককে রাজপথে নিয়ে যাওয়া হবে তার দায়িত্ব পড়ল অভিনেতা বিকাশ রায়ের ওপর। শেষমেশ বন্যাত্রাণে বেরুলেন উত্তমকুমার। তবে, পায়ে হেঁটে নয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল গাড়িতে করে। পথের ভীড়, ঠেলাঠেলি সামলাতে ওই ব্যবস্থা। পথ-পরিক্রমার পথ শ্যামবাজার থেকে বিডন স্ট্রিট। দেশবন্ধু পার্ক থেকে বন্যাত্রাণের মিছিল শুরু সকালে। স্বয়ং উত্তমকুমার রয়েছেন বলেই জনস্রোত। তাঁকে একটু দেখার জন্য সবাই পাগল! বাড়ির মেয়েরা যে যেখানে পেরেছেন দাঁড়িয়ে পড়েছেন জানলায়। বারান্দায়। ছাদে। মিছিলের পুরোভাগে শিল্পীরা। মধ্যভাগে উত্তম। আর সবশেষে পায়ে হেঁটে হাতে গোল টিনের বাক্স নিয়ে চলেছেন অন্যান্য শিল্পী, কলাকুশলী আর সাংবাদিকরা।

পথে নামতে পারছেন না বলে উত্তমকুমারের কী আপশোশ! আর উত্তম মহিলা ভক্তদের কী হাহুতাশ! এত কাছে পেয়েও স্বপ্নের রোম্যান্টিক নায়ককে ছুঁতে পারলেন না। শুধু ক্ষণিকের দর্শনেই দুধের স্বাদ মেটাতে হল ঘোলে।

‘উত্তমের ডান্স মাস্টার হয়েই রইলাম!’

বব দাস

আমি তখন পুরো দস্তুর বক্সিং নিয়ে মেতে। বক্সার হিসাবে বেশ নামডাকও হয়েছে। তবে যে সময়কার কথা বলছি তখন সরাসরি লড়াই থেকে সরে এসে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। যেখানে শেখাতাম, তার নাম ছিল সাউথ ক্যালকাটা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। ল্যান্সডাউন রোড ও মনোহরপুকুর রোডের সংযোগস্থলে এখন যেখানে কে সি মাইতির দোকান তার উল্টোদিকে ছিল একটি খেলার মাঠ। আর সেই মাঠেই ছিল ক্লাবটি। এখন অবশ্য মিষ্টির দোকানটি থাকলেও মাঠটি নেই! গিরিশ মুখার্জি রোডে লুনার ক্লাব নামে একটি ক্লাব ছিল। সেখানকার ছেলেরা আসত বক্সিং শিখতে। তাদের সঙ্গেই অরুণ নামে একটা লম্বা রোগা লিকলিকে চেহারার ছেলে এসেছিল শিখতে। অনেকদিন ধরেই শিখছিল। প্রায় পাঁচ-ছ মাস হয়ে গিয়েছে। সে অনেক কিছু শিখেওছে। বক্সিংয়ে মার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার খাওয়াও শিখতে হয়। অনেকে ভাবে মার দেব কিন্তু খাব না, সেটা হবে না। একদিন ভাবলাম দেখি,

নাচ শেখাচ্ছেন বব

ছেলেটি কেমন শিখেছে। গ্লাভস পরে তৈরি হয়ে ওকে বললাম, এসো আমার সঙ্গে লড়ো। আর লড়তে লড়তেই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। ঠিক ইচ্ছাকৃতভাবে মারিনি। কিন্তু আমার ঘুষিটা গিয়ে লাগল ওর নাকে। ব্যস, নাক ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। কিছুতেই থামে না। তখন তো বাড়িতে বাড়িতে ফ্রিজ থাকত না। পাশেই ছিল কে সি মাইতির মিষ্টির দোকান। সেখান থেকেই বরফ এনে তার নাকে দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেই যে ছেলেটি গেল, আর ফিরে এল না!

তারপর অনেক বছর কেটে গিয়েছে। আমি তখন বক্সিং ছেড়ে নাচ নিয়ে মেতে। ওয়েস্টার্ন ডান্স শেখাই। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমি বব নামে বহুল পরিচিত হলেও আমার আসল নাম ভবানীপ্রসাদ দাস। আমরা ছিলাম এগারোজন ভাইবোন। পরিবার খুব একটা সচ্ছল ছিল না। এক চার্চের ফাদার আমায় মানুষ করেন। তিনিই ভবানী থেকে ভব এবং তা থেকে বব করে দেন। দাস তো অনেক জায়গায় ডিয়াস হয়ে গিয়ে আমাকে একেবারে ভিনদেশি বানিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, একদিন সতু নামে পাড়ারই একটি ছেলে এসে বলল, আপনাকে উত্তমকুমার ডেকে পাঠিয়েছেন, একদিন ওঁর বাড়ি যেতে হবে। আমি যখন গেলাম, তখন উনি সুট পরে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। আমাকে বললেন, কী আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বললাম, আপনি উত্তমকুমার। আপনাকে বাংলার কে না চেনে! উনি বললেন, তা বলছি না। মনে নেই, আপনি ক্লাবে ঘুষি মেরে আমার নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলেন! তখন আমার পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তবে আমি যাকে চিনতাম অরুণ বলে, সেই যে উত্তমকুমার হয়ে গিয়েছে, তা তো জানতাম না। ফলে, কথাটা শুনে বেজায় লজ্জায় পড়ে গেলাম।

সেই শুরু হল অরুণ মানে আপনাদের উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। উত্তম তখন মালা সিনহার সঙ্গে ‘শহরের ইতিকথা’ নামে একটি ছবি করছে, সেই সময় থেকেই ওকে নাচ শেখাতে শুরু করি। ওঁর শেষ ছবি ‘ওগো বন্ধু সুন্দরী’ পর্যন্ত, মানে ওঁর অকালপ্রয়াণ পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। উত্তমের অনুরোধে দু-একটি ছবিতে আমাকে নাচের দৃশ্যে অভিনয়ও করতে হয়। যেমন ‘নায়িকা সংবাদ’-এ ট্রেনের কামরায় একটা নাচের দৃশ্যে ছিলাম, ‘ওগো বধূ সুন্দরী’-তে পার্টির এক দৃশ্যে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়কে একজন নাচের প্রস্তাব দেয়। সেখানে উত্তম যায়নি। এটা ‘হাজব্যান্ডস নাইট’ এই কথা জানিয়ে লোলা বোস তা নাকচ করে দেন। আমিই ছিলাম সেই নাচের প্রস্তাব পেশ করা লোকটি!

প্রতি রবিবার বিকেলে উত্তমের বাড়িতে যেতে হত নাচ শেখাতে। ওর স্ত্রী গৌরীও কিছুদিন আমার কাছে নাচ শিখেছিল। এইভাবে ক্রমে আমি হয়ে উঠেছিলাম ওদের পরিবারের একজন। চীন-ভারত যুদ্ধের সময়কার ঘটনাটা বলি। সেই সময় দার্জিলিং অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ওর পুত্র গৌতম দার্জিলিঙের একটি স্কুলে পড়ত। গৌরী তো উদ্বেগে জেরবার। উত্তম যত বোঝাচ্ছে বুঝছে না। উত্তম বলছে, আরে, ওখানে তো আরও অনেক ছেলে আছে, ও তাদের সঙ্গে আছে, এতে চিন্তা কিসের! গৌরী কোনও যুক্তিই শুনতে নারাজ। এদিকে উত্তম তখন শ্যুটিং নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। ওখানে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে আসার একটুও সময় নেই। অগত্যা আমার ওপরেই দায়িত্ব পড়ল দার্জিলিঙে গিয়ে গৌতমকে নিয়ে আসার। এরকম আরেকবার উত্তমের দূত হয়ে যেতে হয়েছিল, আর সে নিয়ে কম অশান্তিও হয়নি। ‘দূর গগন কি ছাঁও মেঁ’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য সুপ্রিয়া দেবীর বোম্বে যাওয়ার কথা ছিল। সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল উত্তমের। কিন্তু যথারীতি বাদ সাধে ব্যস্ততা। অগত্যা আমাকেই সুপ্রিয়া দেবীর ম্যানেজার করে পাঠিয়ে দেয়। একদিন শ্যুটিং ছিল না। আমরা দুজনে আড্ডা মেরে, সুইমিং করে কাটাই। সন্ধেবেলা উত্তম ফোন করেছিল সুপ্রিয়াকে। সুপ্রিয়ার মুখে ববের সঙ্গে সুইমিং পুলে সময় কাটানোর কথা শুনে নাকি উত্তম ভয়ানক চটে গিয়েছিল। সাতদিন নাকি ফোনই করেনি। এদিকে উত্তমের

সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে সুপ্রিয়ার মানসিক অবস্থাও সঙ্গীন। পরে পুরো ব্যাপারটা আমি সুপ্রিয়ার কাছে জানতে পারি। তবে ওটা ছিল উত্তমের নিছক ছেলেমানুষি। আমার সঙ্গে অবশ্য একটুও সম্পর্ক খারাপ হয়নি। উত্তমের বাড়িতেই আমার সঙ্গে শ্যামল মিত্র থেকে ভূপেন হাজারিকা, বহু বিখ্যাত মানুষের আলাপ হয়েছে।

উত্তম চট করে শিখে নিতে পারত সব কিছু। নাচের ক্ষেত্রেও তাই। খুব কম সময়ে নাচ তুলে নিত। স্থানভেদে বলরুম ডান্সের কয়েকটি ভাগ আছে। তার মধ্যে উত্তম ওয়াল্‌স খুব ভাল রপ্ত করে। এই নাচটি দেখতে খুব সুন্দর। শরীরের ছোট্ট ছোট্ট মোচড়ে ফুটিয়ে তোলা যায়। স্টেপিংটা যে উত্তম খুব ভাল পারত, তার প্রমাণ 'ছোটি সি মুলাকাত' ছবিটা। ছবিটা চলেনি, কিন্তু উত্তম সমানে পাল্লা দিয়েছে বৈজয়ন্তীমালার মতো দক্ষ নাচিয়ের সঙ্গে। আমার একটাই আক্ষেপ, সেই সময়ের পরিচালকেরা উত্তমের নাচের দক্ষতাকে তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। আমার প্রিয় নাচ ছিল স্প্যানিশ ট্যাঙ্গো ডান্স। উত্তম এটাও শিখেছিল।

'শহরের ইতিকথা' থেকে শুরু করে তারপর রক্তপলাশ, হাসি শুধু হাসি নয়, সূর্যতপা, নায়িকা সংবাদ, জয়জয়ন্তী, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, অপরিচিত, সোনার খাঁচা, অন্ধ অতীত, শুধু একটি বছর, সব্যসাচী, ওগো বধূ সুন্দরী– বহু ছবিতেই উত্তমের একটু-আধটু নাচের দৃশ্য আছে। আর তার পিছনে আছে আমার নগণ্য অবদান।

'তিন ভুবনের পারে' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে 'কে তুমি নন্দিনী' নেচেছিলেন, তাও আমার তালিমে। 'সম্রাট ও সুন্দরী' থেকে 'বারবধূ'– অনেক নাটকেও আমি নাচের তালিম দিয়েছি। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী থেকে সুপ্রিয়া, কালী ব্যানার্জি, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অঞ্জনা ভৌমিক, মিস শেফালি থেকে শতাব্দী রায়– আমার ছাত্রছাত্রীর তালিকা দীর্ঘ। ছবি বিশ্বাস তো আমাকে 'ভাল্লুক মাস্টার' বলে ডাকতেন।

বিভিন্ন ছবির শ্যুটিংয়ের সময় উত্তমকুমারের সঙ্গে গিয়েছি। ওঃ, সারাদিন শ্যুটিং করে একরকম কাটত। রাতেই ছিল যত মুশকিল। ওর ভীষণ ভূতের ভয় ছিল। তখন একেবারে বাচ্চাদের মতো। একবার লক্ষ্ণৌতে কি একটা ছবির শ্যুটিংয়ে আমাদের থাকতে হয়েছিল পুরনো এক নবাবের বাড়িতে। রাতে এত ভয় পেয়েছিল, পরদিন আর থাকতে চায়নি। আরেকটা জিনিস দেখেছি, ঘুমোবার আগে ওর পা টিপে না দিলে ঘুম হত না। আর শুনলে হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করবেন না, বাথরুমে গিয়ে বিড়ি খেত। একটু বড় সাইজের বিড়ি। ওটা না খেলে নাকি পেট পরিষ্কার হত না।

সেটা মারা যাওয়ার কয়েক বছর আগে হবে, উত্তম একদিন নিজের থেকেই আমাকে বলল, 'অনেকের জন্য তো অনেক কিছু করেছি, কিন্তু ওহে ডান্স মাস্টার তোমার জন্য তো কিছু করা হল না। তোমাকে বরং আমার 'সন্ন্যাসী রাজা' সিনেমার ফিফটি পারসেন্ট কপিরাইট দিয়ে যাই। আমি নিতে রাজি হই না। কারণ, অনেকে আমাকে ভয় দেখায়, ও সব নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় ফেঁসে যেতে হবে ইত্যাদি। আমি ছবিটির কপিরাইট নিতে রাজি না হওয়ায় উত্তম একটু রেগেই যায়। আমাকে বলে, তাহলে তুমি ডান্স মাস্টার হয়েই চিরকাল থাকো!'

সত্যিই আমি ডান্স মাস্টার হয়েই রয়ে গিয়েছি। এখন বয়স নব্বই পেরিয়ে গিয়েছে। আর কটা দিন বাঁচব জানি না। ছবিটির কপিরাইট নিলে হয়ত আর্থিকভাবে কিছুটা লাভবান হতাম। কিন্তু ওই মানুষটার যে ভালবাসা পেয়েছি, তার দামও কম নয়। ওটা নিয়েই যেতে চাই।

অনুলিখন সমীরকুমার ঘোষ

উত্তমকুমারের মামারবাড়ি

স্মৃতি আগলে রয়েছেন সেজমামিমা

সমীরকুমার ঘোষ

বাঙালি পরিবারের দস্তুর মতো অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে উত্তমকুমারেরও জন্ম হয় মামারবাড়িতে। উত্তর কলকাতার আহিরীটোলায়। বিদেশে হলে হয়ত বাড়িটির গায়ে একটি ফলক থাকত, আর তাতে 'এই বাড়িতে বাংলা ছবির মহানায়ক উত্তমকুমার জন্মিয়াছিলেন' জাতীয় কোনও বয়ানও থাকত। না, যে বাড়িতে মহানায়ক জন্মেছিলেন, সেই বাড়িতে তেমন কিছুই লেখা নেই। তবে 'উত্তমকুমারের মামারবাড়ি কোনটা?' এই প্রশ্নটা

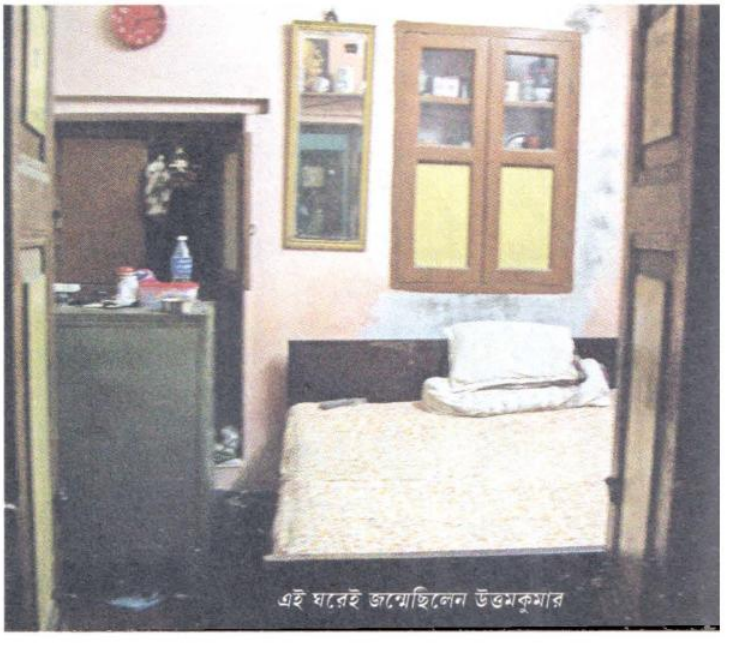
এই ঘরেই জন্মেছিলেন উত্তমকুমার

সেজমামিমা মুকুল মুখোপাধ্যায়

করলে পাড়ার লোকজন এক কথায় দেখিয়ে দিচ্ছেন। পুরনো কলকাতার বাড়ি যেমন হয়, এটিও তেমনি। সদর দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে দু দিকে এখনও রয়ে গিয়েছে সিমেন্ট-বাঁধানো রক। এক সময় উত্তর কলকাতায় রাস্তার ধারের প্রায় সব বাড়িতেই এমন রক থাকত। যেখানে সন্ধেবেলায় বয়োজ্যেষ্ঠরা বসতেন আড্ডা মারতে, শীতের দুপুরে তাস খেলতে। কোনও কোনও রক কিছু চ্যাংড়া ছেলেপুলে সবসময়েই দখলে রাখত। ওদের বলা হত রকবাজ।

অনেক দিনের পুরনো বাড়ি। সদর দিয়ে ঢুকলে খানিকটা পথ, ডানহাতি, বাঁহাতি দুটো ঘর, এক সময় যা বৈঠকখানা ছিল। একটু এগোল এক চিলতে উঠোন, তারপর বাঁহাতি উঠে গিয়েছে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। এই বাড়ির বর্তমানে প্রবীণতম সদস্য হলেন উত্তমকুমারের সেজমামিমা মুকুল মুখোপাধ্যায়। ফর্সা, সুশ্রী চেহারা। বয়স পঁচাত্তর। তবে শরীর ও মনে এখনও তাজা। উত্তমকুমারের কথা বলতেই স্মৃতিতে ডুব দিলেন। বললেন, একেবারে ছেলেবেলায় তো ওকে দেখিনি! আমার বিয়ে হয় ১৯৫০ সালে। তখন তো ওর একটা-দুটো ছবি করা হয়ে গিয়েছে। বিয়েও হয়ে গিয়েছে। তবে মনে আছে, আমার বিয়েতে ও বরযাত্রী হয়ে এসেছিল। আর বিয়ের পরে পরেই আমরা ওর অভিনীত 'দৃষ্টিদান' ছবিটি দেখতে গিয়েছিলাম। কোন হলে, সেটা অবশ্য মনে নেই। আমরা অবশ্য ওর অরুণ নামটা জানতাম না। ওর দাদামশাই জন্মানোর পরই নাম রেখেছিলেন উত্তম। মামারবাড়িতে সবাই ওকে ছোট থেকেই উত্তম নামে জানত। মেজভাসুর গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় পোর্ট কমিশনার্স অফিসে ক্যাশিয়ার ছিলেন। সেই সময় ক্যাশিয়ারদের বেশ ক্ষমতা ছিল। উনিই ক্যাশ বিভাগে উত্তমের চাকরি করে দিয়েছিলেন বলে শুনেছি। তারপর তো একদিন উত্তম এসে বলল, আমি আর চাকরি করব না, পুরোপুরি অভিনয়ই করব। তখন তো ওর তেমন নামডাক হয়নি। মামারা বেশ চিন্তিত ছিলেন। তবে কেউ বাধা দেননি।'

উত্তমকুমারের দাদু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। উনি প্রয়াত হন ১৯৪২ সালে। তার বছর দুই পরেই মারা যান দিদিমা সরলাবালা দেবী। ওঁদের চার ছেলে— ধীরেন্দ্রনাথ, গৌরীশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র। এই রামচন্দ্র যুবক বয়সেই মারা যান। আর চার মেয়ের নাম— চঞ্চলা, চপলা, অনিলা ও ঊর্মিলা। চপলা হলেন উত্তমের মা। বর্তমানে মামারা বা তিন মাসির কেউই বেঁচে নেই। মামারবাড়িতে থাকার মধ্যে রয়েছেন বড়মামার দুই ছেলে (আরও দুজন অন্যত্র থাকেন), মেজমামার এক ছেলে, সেজমামার তিন ছেলে। তার মধ্যে বড় ছেলে প্রয়াত, মেজ ও ছোট রয়েছেন। মামারবাড়িতে যে ঘরটিতে উত্তমকুমার জন্মেছেন, সেটা একসময় ছিল বাড়ির আঁতুরঘর। সেই ঘরটিতে এখন সপরিবার থাকেন মেজমামার ছেলে সমর মুখোপাধ্যায়।

উত্তমকুমারের মামারবাড়ির প্রতি টান ছিল কেমন? ঘন ঘন আসতেন?

মামারবাড়ির ওপর ওর ছোট থেকেই ভীষণ টান। ছোটবেলায় যে এখানেই অনেকগুলো দিন কেটেছে। ওর মামাদের মুখে শুনেছি, এখানে এলেই মাঝে মাঝে কুমোরটুলিতে গিয়ে ঠাকুর তৈরি করা দেখত। সেই সময় লোকের বাড়িতে ভাল জলের পাশাপাশি গঙ্গাজলের সংযোগও থাকত। সেই জলের ট্যাঙ্কের তলায় থিতিয়ে যেত মাটি। উত্তম সেই মাটি দিয়ে ঠাকুর তৈরি করে পুজো করে আবার ট্যাঙ্কেই বিসর্জন দিয়ে দিত। আমার বিয়ের পর ও যখন স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকে অভিনয় করত, আমরা দেখতে গিয়েছি। দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল নাটকটা। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ও অসাধারণ অভিনয় করতেন। এই নাটক চলার সময় মাঝে মাঝেই উত্তম চলে আসত আমাদের বাড়ি। কখনও থেকেও যেত। ষাটের দশকের শেষের দিকে ওর আসা বন্ধ হয়। তখন তো ওর প্রচণ্ড নামডাক। একদিন ও লুকিয়েই এসেছে, কিন্তু কোথা থেকে কেউ দেখে ফেলে। খবর চাউর হয়ে যেতেই হাজার হাজার লোক হাজির। সদর দরজা প্রায় ভেঙে ফেলে। আশপাশের বাড়ির ছাদ, বারান্দায় ছেলেমেয়েতে লোকারণ্য। সবার দাবি উত্তমকে দেখবে। শেষে বারান্দা দিয়ে দেখা দিয়ে উত্তম বিনীত আবেদন জানায় সবার কাছে, তারপর মুক্তি। তখনই মামারা বলে দেন, 'তুই আর আসিস না। কারণ এত ভিড়ে কোনও বিপদ ঘটে গেলে তার দায় বর্তাবে আমাদের ওপর।' না, তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আর ও আসেনি। মানে আসতে পারেনি। এমনকি ছেলে গৌতমের বিয়েতে নেমতন্ন করতেও নয়। মা আর ভাই তরুণকে পাঠিয়েছিল। প্রসঙ্গত জানাই, উত্তমের মা হল আমার মেজ ননদ।'

আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল?

সম্পর্কে আমি বড় হলেও বয়সে উত্তমের চেয়ে ছোট ছিলাম। এই জন্যই উত্তম বলত, দূর তুমি একটা পুঁচকে মেয়ে, তোমাকে কি মাইমা বলে ডাকব! তোমাকে সেজমাইমা না বলে ডাকব 'সেজমি' বলে। আর সত্যিই ওই নামে ডাকত। দুই বাড়ির মধ্যে খুব আসা-যাওয়া ছিল। আমার বাপের বাড়ি ওদের বাড়ির কাছেই। সেখানে গেলেও তাই চলে যেতাম। একবার জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নামে একটা নাটক দেখতে গিয়েছি। আমার দূর সম্পর্কের মামা কমল চট্টোপাধ্যায় পাস দিয়েছিলেন। গিয়ে দেখি, সেখানে অসিতবরণকে নিয়ে উত্তম হাজির। আমাকে দেখতে পেয়েই এসে খবরাখবর নিতে লাগল। তারপরই প্রশ্ন, কিসে করে যাবে তোমরা? আমি জানাই, কাছেই যাব, চিন্তা নেই। ও বলল না, আমার গাড়ি নিয়ে যাও। আমি জানালাম, আমার সঙ্গে অনেক লোক আছে। ও গোপালকে বলল, তুই কয়েকবার আসা-যাওয়া করে দিয়ে আসবি। আমি বললাম, তুমি কিসে করে যাবে। উত্তম বলল, আমি কালোদার গাড়িতে চলে যাব। কালোদা মানে অসিতবরণ। এই হল ওর আন্তরিকতা। এর পরিচয় বারবার পেয়েছি।

কোনও বিশেষ স্মৃতি?

মনের মধ্যে কত কথা ভিড় করছে, কত বলব। এ বাড়িতে অনেককেই ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। একবার সুচিত্রা সেনকেও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু লোক জানাজানির ভয়ে ওকে ওপরে নিয়ে আসেনি গাড়িতেই বসিয়ে রেখেছিল। সুচিত্রা অবশ্য এ দিকে একাধিকবার এসেছেন। কুমোরটুলিতে রমেশচন্দ্র পালের কাছেও এসেছেন ঠাকুরের নকশা তৈরি করাতে।

ওঁকে শেষ কবে দেখেছেন?

'সেটা মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে। ওদের ভবানীপুরের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো ছিল, গিয়েছিলাম। রাতে যখন চলে আসব, উত্তম জিজ্ঞেস করল এত রাতে তুমি যাবে কিসে করে? আমি বললাম, কোনও বাস বা ট্যাক্সি পেয়ে যাব। উত্তম বলল, সেকি আমার এতগুলো গাড়ি কি এমনি এমনি রয়েছে! ওর গাড়ির চালক ছিল গোপাল। গোপালকে ডেকে বলে দিল, যা সেজমিকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আয়। সেই শেষ দেখা। ও যেদিন মারা গেল আমরা জানতে পারিনি। খবর পাই অনেক পরে। পাড়ার একটা ছেলে এসে খবর দেয়। পরে বুড়ো মানে তরুণ জানায়, দাদার মৃত্যুর খবরটা এতটাই আকস্মিক ছিল, যে বোধবুদ্ধি যেন সব হারিয়ে ফেলি। মৃত্যুর খবর কাকে দেব, না দেব, মাথা কিছুই কাজ করছিল না। গিয়ে দেখলাম, কে বলবে ও মারা গিয়েছে। যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে!'

বলতে বলতে বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন মুকুল দেবী। বললেন, উত্তম শুধু বড় অভিনেতাই তো নয়, বড় মনের মানুষও যে ছিলেন।

উত্তমকুমারের জীবন

◆ জন্ম আহিরীটোলায় মামারবাড়িতে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। জন্মাবার সময়েই দাদু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নাম রেখেছিলেন উত্তম।
◆ স্কুলে পড়ার সময় ভবানীপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েনের সভ্য হিসাবে সাঁতার কাটতেন পদ্মপুকুরে। অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে কাপ, মেডেল পেয়েছেন। দারুণ ফ্রি স্টাইল কাটতেন।
◆ ইন্দিরা সিনেমার পিছনে মল্লিক লেনে নসীবাবুর আখড়ায় যেতেন কুস্তি লড়তে।
◆ গান শেখেন নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চক্রবেড়িয়া মনোরমা স্কুলে কিছুদিন সঙ্গীতের শিক্ষকতাও করেছেন।
◆ বছর ১৫-১৬ বয়সে 'আগামীকাল' নাটকে একটা ছোট্ট ফিমেল রোলে অভিনয় করেন।
◆ ১৯৩৯ সালে উপনয়ন হয়।
◆ ছোটবেলায় বাড়িতে যত সরস্বতীপুজো হত, তার ঠাকুর গড়ত উত্তম। মামারবাড়িতে গেলে কুমোরটুলিতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দেখত প্রতিমা তৈরির কৌশল।
◆ মেজমামা গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় পোর্ট কমিশনার্স অফিসে ক্যাশিয়ারের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন ১৯৪৬-এ। মাইনে ছিল মাসে ২৭৫ টাকা।
◆ জেঠতুত বোন অন্নপূর্ণার বান্ধবীকে দেখেই প্রেম। গৌরীরানী গাঙ্গুলি থাকতেন ল্যান্সডাউন রোডে। পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে উত্তম-গৌরীর বিয়ে হয়, ১৯৫০-এর ১ জুন।
◆ ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওয় দৈনিক পাঁচ সিকি পারিশ্রমিকে প্রথম চাকরি প্রথম দিকে উত্তমের কথার মধ্যে সামান্য একটু তোতলামি ছিল। সেজন্য তিনি নাকি গালে বোম্বাই সুপুরি রেখে বহুদিন কথা বলা অভ্যেস করেছেন।
◆ ১৯৫০-এ এম পি স্টুডিওয় স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে যোগ দেন। মাসে মাইনে ছিল ৪০০ টাকা।
◆ ১৯৪৮-এ 'মায়াডোর' (হিন্দি)-এ প্রথম অভিনয়ের সুযোগ। কিন্তু কয়েকদিন শ্যুটিংয়ের পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
◆ ১৯৪৮-এ 'দৃষ্টিদান' ছবিতে নায়ক অসিতবরণের ছোটবেলার ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ।
◆ প্রথম নায়ক 'কামনা' ছবিতে, ১৯৪৯ সালে। নায়িকা ছিলেন ছবি রায়। সিনেমায় নাম ছিল অরুণকুমার।
◆ ১৯৫০-এ 'মর্যাদা' ছবিতে আবার নামবদল। অভিনয় করেন 'অরূপকুমার' নামে। এই একটা ছবিই অরূপকুমার নামে করেছেন। এই ছবির দৌলতেই এম পি স্টুডিওয় আগমন।
◆ ১৯৫১ সালে 'সহযাত্রী', 'ওরে যাত্রী' এবং 'নষ্টনীড়'– তিনখানি ছবিই ফ্লপ। টালিগঞ্জে তারপরেই অরুণকুমারের নাম 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল' হয়ে যায়।
◆ ১৯৫২ সালে 'সঞ্জীবনী' ছবিতে প্রথম 'উত্তমকুমার' নামে অভিনয়।
◆ প্রথম হিট ছবি নির্মল দে পরিচালিত 'বসু পরিবার'। এই ছবিতেই প্রথম সুপ্রিয়ার সঙ্গে অভিনয়।
◆ সুচিত্রা সেনের সঙ্গে প্রথম অভিনয় 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে। ১৯৫৩ সালে।
◆ উত্তমকুমার প্রযোজিত প্রথম ছবি 'হারানো সুর' ১৯৫৭ সালে। ছবিটি ভারত সরকারের 'সার্টিফিকেট অভ মেরিট' পায়
◆ ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হৃদ' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সাংবাদিকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ নায়কের পুরস্কার। নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যারানী।
◆ উত্তমকুমার প্রযোজিত হিন্দি ছবি 'ছোটি সি মুলাকাত'। এটিই তাঁর অভিনীত প্রথম হিন্দি ছবি।
◆ ভারত সরকার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান জানাতে 'ভরত পুরস্কার' চালু করে। ১৯৬৭-তে প্রথম পুরস্কার পান উত্তমকুমার, 'চিড়িয়াখানা' ও 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবির জন্য
◆ উত্তম গৌরীদেবীকে 'গজু' বলে ডাকতেন। চিঠিতে 'হাতি মেরে সাথী'ও লিখতেন
◆ গৌরী উত্তমকে আড়ালে ডাকতেন 'বণিক' বলে। চিঠিতেও লিখতেন
◆ ফুলশয্যার রাতে গৌরীকে বলেছিলেন, 'না, কোনো মধুর প্রেমালাপ নয়। বাড়িতে আমার মা, বাবা, ভায়েরা রয়েছেন। সকলকে নিজের মতো ভালবাসবে।'
◆ সুপ্রিয়া উত্তমকে 'বাবি' বলতেন
◆ 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' ছবির একটা দারুণ শটের পর উত্তম সবার সামনেই চুমু খেয়ে ফেলেন সুপ্রিয়াকে।

'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবির বিশেষ একটি মুহূর্ত

◆ উত্তমের প্রিয় রঙ সাদা।
◆ প্রিয় পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি।
◆ প্রিয় গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
◆ প্রিয় নায়ক পিসি বি (প্রমথেশ বড়ুয়া)।
◆ প্রতিদিন গীতা পড়তেন সংস্কৃত উচ্চারণ নিখুঁত করার জন্য।
◆ ইংরেজি ও উর্দু রিডিং টেপ করতেন নিজের বাচনভঙ্গিকে অনর্গল করার জন্য।
◆ প্রতিদিন যোগব্যায়াম করতেন।
◆ গৌতম তখন বছর পাঁচেকের। পড়াচ্ছিলেন উত্তম। গৌতম ক খ গ-এর বদলে বারবার ক গ খ বলছিল। কয়েকবার শোধরানোর পর উত্তম বাঁ হাতে সপাটে চড় কষান। জ্ঞান হারায় গৌতম। ওই একবারই ছেলের গায়ে হাত তুলেছিলেন।
◆ উত্তমের খুব ভূতের ভয় ছিল। বিয়ের আগে পর্যন্ত ভাই তরুণকে পাশে নিয়ে শুতে হত।
◆ স্টার-এ 'শ্যামলী' নাটকে অভিনয় করেছেন উত্তম, ১৯৫৩ সালে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।
◆ উত্তম পরিচালিত ছবি চারটি– শুধু একটি বছর (৬৬-৬৭), 'বনপলাশীর পদাবলী' (৭২-৭৩), 'দুই পৃথিবী' (পরিচালক পীযূষ বসু মারা গেলে বাকি অংশ পরিচালনা করেন) ও 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' (৭৯-৮০)
◆ 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিতে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা, ১৯৬৬ সালে।
◆ প্রথম ডাবল রোলে অভিনয় করেন 'তাসের ঘর' ছবিতে, ১৯৫৭-য়।
◆ ৭ ডিসেম্বর ১৯৫৯ মারা যান বাবা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
◆ 'নবজন্ম' ছবিতে নচিকেতা ঘোষের সুরে ছ'টি গান গেয়েছিলেন উত্তম, ১৯৫৬-য়।
◆ ১৯৭৩-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিষয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্রে ভাষ্যপাঠ করেন। এটির প্রযোজক ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
◆ ১৯৭৬-এ আকাশবাণীতে 'দুর্গে দুর্গতিহারিণী'-তেও ভাষ্যপাঠ করেন। প্রচারিত হয় মহালয়ার দিনে।
◆ *কবিতা সিংহের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়* এবং সুচিত্রা সেনের সঙ্গে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টের কথা স্বীকার করেন।
◆ 'বাহান্ন তিপান্ন বছরের পর থেকে আমি ডিরেকশনের দিকে চলে যেতে চাই। তার কয়েক বছর বাদেই একেবারে off'। বলেছিলেন উত্তমকুমার।
◆ 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবিতে অভিনয় করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রয়াত হন ২৪ জুলাই ১৯৮০। ⌘⌘

কবিতা

শর্ত

রণজিৎ দাশ

ভিখারিকে পয়সা দিলে
তবেই সে গুণ গায়, মঙ্গলকামনা করে

তুমিও আমাকে যদি
অন্তত একটা তোমার মুখের ছবি ছাপা উল্কাখণ্ড দাও—
তাহলেই, তোমার এই মন্দার বাজারে,
আমিও তোমার গুণ গাইব, আর মঙ্গলকামনা করব

না হলে, তোমার নামে
কুকুর পুষেছি, আর কুকুর পুষব

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

মৌ ভট্টাচার্য

রানওয়ের মাটি ছেড়ে প্লেনটা
উড়েছিল ঠিক একটায়। তারপর
থেকে এতটা সময় নিখোঁজ হয়ে গেছে।
আকাশের অলি-গলি দিয়ে কোন উড়ালের
পানে - পশ্চিম না পুব, উত্তর না দক্ষিণ—
প্রায় ৩০ ঘণ্টা পেরিয়ে বিপবিপ শব্দ
বেজে ওঠে মোবাইলে - আমরা সপরিবারে
স্বস্থানে পৌঁছে গেছি - কিন্তু নিখোঁজ
হয়ে যাওয়া উড়াল ছুটে চলেছে এখনও
সময়ের পেছনে, দৌড়োচ্ছে, পার
হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডেটলাইন - চব্বিশ
ঘণ্টা প্লাস না মাইনাস কে জানে?

স্পর্শশিহরিত

উজ্জ্বল সিংহ

তোমাকে যখনই ছুঁতে যাই তুমি
জ্বলে ওঠো যেন অত্যুজ্জ্বল কোনও প্রাণ
কামনা-বাসনা সব পুড়ে যাবে
ভেবে বিমর্ষ আমার তখন তীব্র তীক্ষ্ণ
ষড়রিপুগত ঘ্রাণ।

তাহলে কোথায় আশ্রয় আমার
কোথায় মেটাব তৃষ্ণা!
মহাভারতের পৃষ্ঠা ছিন্ন করে তুমি তবে
আমাকে পোড়াও, কৃষ্ণা।

জীবনযাপনে আমারই প্রকৃতি
তুমি জল বায়ু আলো সমুদ্র
পুরুষ শরীরে জ্বলন্ত স্থিতি–

অসম্ভবের চূড়ায় দাঁড়িয়ে
সন্ত্রাসে কাঁপে আমার দৃষ্টি
দেখব কীভাবে গিলে খায় এই সত্তাকে ওই
অশরীরী শিখা-পুষ্পের বৃতি।

ডাইমেনশন

তিলোত্তমা বসু

এবার সারাটা পুজোয় মাইকে ছোটবেলার গান
বাজছে—
গদ্যের ভিতর বাজছে ছন্দের আলতা পা... নূপুর!
এমনকি শীতের বিকেলে বসন্তকালের গন্ধ
তবে কি মৃত্যুর হাতের গোলাপে, আমি কালো রঙ
লাল হয়ে গেছি?
সময়কে কার্পেটের মতো গুটিয়ে
সব ধুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলতে পেরেছি!

এক একটা গানের সঙ্গে উড়ে আসে
এক একটা পক্ষীরাজ, অন্ধ রাজকুমারের চোখের
পলক...

ফুঁ দিলে কয়েক হাজার বন্দর..
সাদা পাল... বালুচর পর্যন্ত
সুদূর খুলে যাবে!

ছবি: দীপঙ্কর রায়

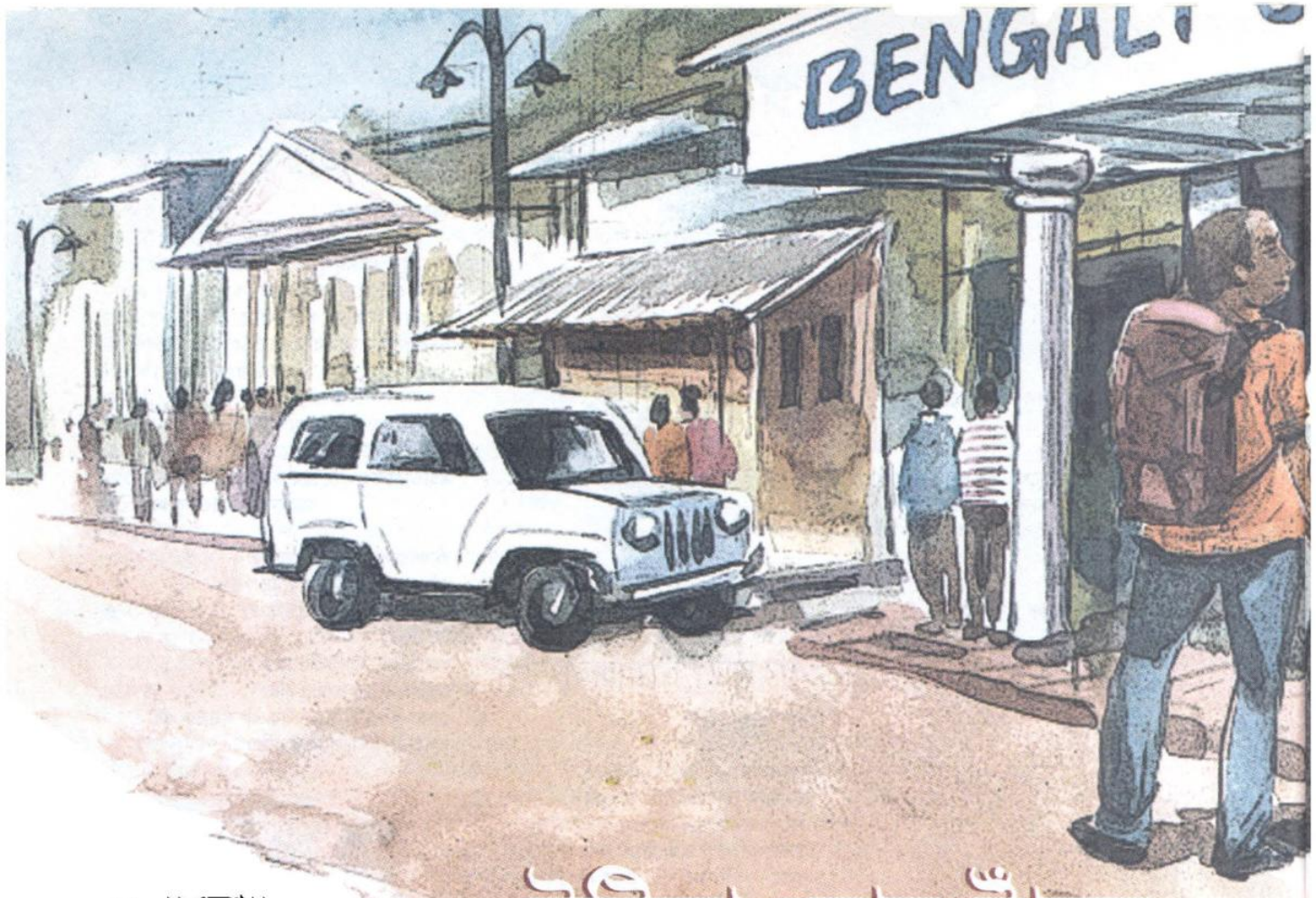

ধারাবাহিক উপন্যাস

।। একুশ ।।

টুটিলাওয়ার টাঁড়ে

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে :

এবারে ঋজুদার গন্তব্য টুটিলাওয়ার টাঁড়। সেখানে তাঁরা ডাঙ্গু মিঞার অতিথি। তবে ঋজুদা ঠিক করলেন তাঁরা ইজাহারের কুন্দ্রুগুটুর কাছারিবাড়িতে চলে যাবেন। রাতে জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা আবিষ্কার করলেন একটি টেপরেকর্ডার। কুন্দ্রুগুটুর জঙ্গলের পথে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল যারা ডাঙ্গু মিঞার কাছে যাচ্ছে রণপা-র জন্যে লম্বা লম্বা মোটা বাঁশ নিয়ে। ঋজুদা রুদ্র আর ভটকাইকে রাতে জঙ্গলে পাঠালেন ওদের কান্ড কারখানা দেখতে। সেখানে ঘটল এক কান্ড। ওরা সেখান থেকে একজনকে গাড়ির বুটে ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে এল। দেখা গেল সে তাদের পূর্ব পরিচিত পরম। পরমকে খাইয়ে দাইয়ে সে রাতটা রেখে পরদিন তাকে তার গ্রাম সিঁদুরে পাঠিয়ে দিলেন ঋজুদা। গভীর রাতে খবর আসে পরমকে কারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। পরদিন সকালে ঋজুদা বাদে বাকি সকলে পরমের অন্ত্যেষ্টিতে সিঁদুর গ্রামে যায়। সেখানে ভটকাই প্রথমে অচেনা আগন্তুকদের গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে নেয়। পরে তাদের কান কেটে ফেলে।

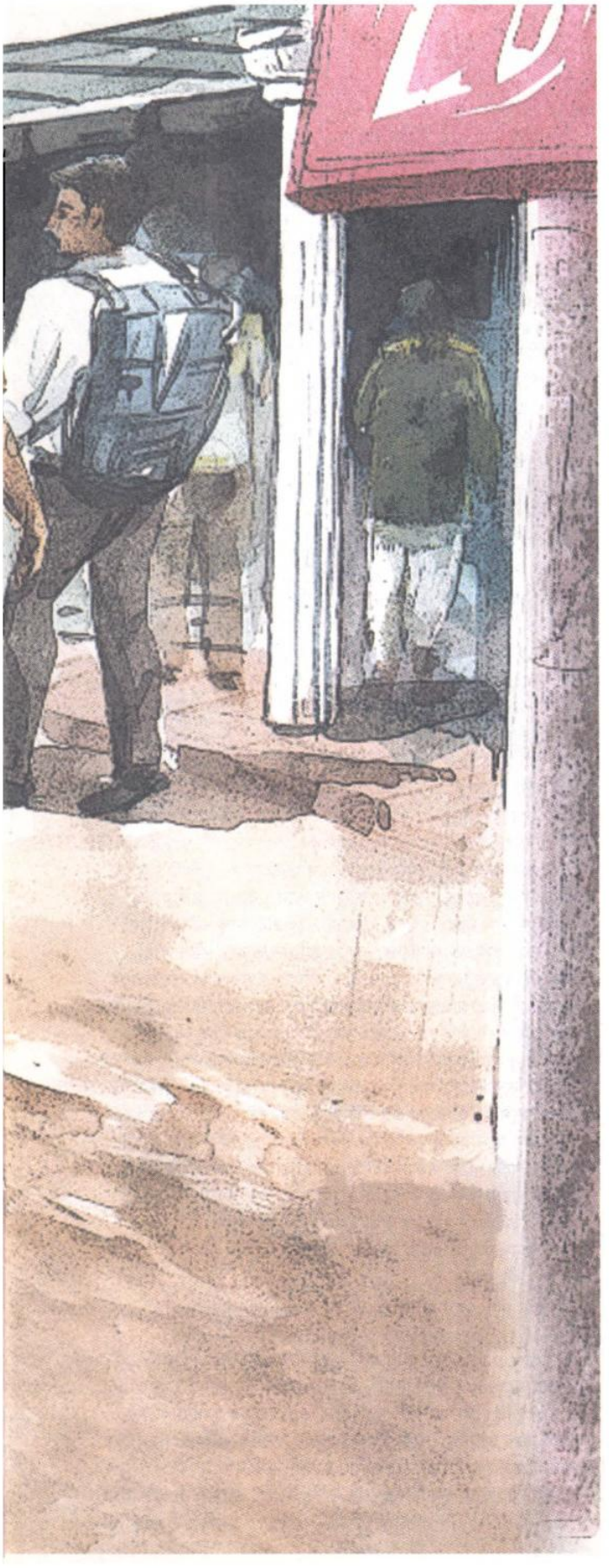

আমরা হাজারিবাগ শহরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ভটকাইকে বললাম, চল একবার বেঙ্গলি সুইটস ঘুরে যাই। ভারি ভাল রাবড়ি করে ওরা। ঋজুদার সঙ্গে যতবারই হাজারিবাগে এসেছি ততবারই হান্নানের দোকানের মুসলমানি খাবার আর বেঙ্গলি সুইটসের রাবড়ি খেয়েছি। রাবড়ি খেতে ঋজুদা খুবই ভালবাসে।

— আমিও বাসি। ভটকাই বলল।

বেঙ্গলি সুইটসের দোকানের আশেপাশে অনেক দোকান হয়ে গেছে। এই পথেই হাসপাতালটা পড়ে। দোকানটার সামনে না পিছনে ঠিক খেয়াল নেই। আগে এই পথের মোড়ে, পাঞ্জাবিদের মস্ত মস্ত দুটো খাবার-দাবারের দোকান আর হোটেল ছিল। বহু বছর আগে ঋজুদা, গোপালদা, সুব্রতদার ছোট ভাই মুকুলদা হাজারিবাগের ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, জেঠুমণির পরিচিত রহমান সাহেব এবং ভুতোদাদারা রাতে বে-কানুনি করে টুটিলাওয়ার পথে শুয়োরের দলের উপরে হামলে পড়ে অনেকগুলো শুয়োর মেরেছিল। তারপরে গোপালদাদাদের বাড়িতে ফেরার পরে গোপালদাদা ভুতোদাদাকে পাঠিয়েছিল এই পাঞ্জাবি হোটেলে। ওদের উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল ভুতোদাদা। তারপর পূর্বাচলের বাগানের মধ্যে এক সারি বড়কা-ছোটকা শুয়োর দেখিয়ে দরদাম করে ভুতোদাদা টাকা গুনে নিয়ে শুয়োর শুদ্ধু ওদের আবার পৌঁছে দিয়ে এসেছিল এই হোটেলে।

ভটকাই বলল, তোর সব মনে থাকে। বললাম, শিকারের সঙ্গীর মধ্যে দুজন— একজন রহমান সাহেব, আরেকজন নাজিম সাহেব— দুজনেই মুসলমান। তাঁরা শুয়োর খাবেন তো নাই-ই— ছোঁবেন পর্যন্ত না। একটা ছোট শুয়োর গোপালদা করমের জন্য রেখে দিয়েছিল, পরদিন সকালে ও এলেই ওকে দিয়ে দেবে, সিঁদুর গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে সকলে মিলে মজা করে খাবে।

—আর তোরা নিজেরা খেলি না?

—খাব না কেন? চমনলাল রাঁধল আমাদের জন্য। কষে তেল ও ঝাল দিয়ে। তবে চারটে ঠ্যাংয়ের মধ্যে দুটি ঠ্যাং স্মিথ সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিল গোপালদাদা। সঙ্গে ঘি, তেল, মশলা সব দিয়ে। আহা কী দুর্দান্ত ভিণ্ডালু রেঁধেছিলেন স্মিথ সাহেব তা কী বলব। নিজের জন্যে কিছুটা রেখে বেশিটাই আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর কোনও কাজের লোক ছিল না, বাড়ি ঝাড়-পোঁছ, বাড়ির রান্নাবান্না সব উনিই করতেন। বাড়ির বিহারি মালিক থাকতেন পাটনাতে— কখনও সখনও আসতেন— নইলে ওই বাড়িকে আমরা স্মিথ সাহেবের বাড়ি বলেই জানতাম। স্মিথ সাহেব সাইকেল চালিয়ে সপ্তাহে একদিন বাজারে যেতেন। গোপালদাদা যখন থাকতেন তখন গোপালদাদা ওঁর জন্যে চমনকে দিয়ে যা রান্না হত তাই পাঠিয়ে দিতেন।

তারপর বললাম, জানিস ভটকাই, মানুষ বুড়ো হলে দেখতে যেমন সুন্দর হয়, তার ব্যবহারও তেমন মিষ্টি হয়।

—উলটোটাও হয়। অনেক দেখেছি আমি। সাংসারিক ব্যাপারে তোর জ্ঞানগম্মি বেশ কম।

আমাকে ধমক দিয়ে বলল, ভটকাই।

বললাম, তাই হবে। সব জ্ঞান কি সকলের থাকে।

— এবার রাবড়ির দাম দিয়ে তাড়াতাড়ি চল কুন্দ্রুগুটু— প্রণব মুখুজ্যের সাদা আলুর তরকারি আর ফুলকো লুচির ব্রেকফাস্ট পণ্ড হওয়ার জোগাড় হল দেখছি।

বললাম, লুচি কি আর আগের থেকে ভেজে রাখবে। লেচি করে রাখবে, আমরা যখন খাব তখন লুচিটা গরম গরম ভেজে দেবে।

লুচি কিন্তু রাবড়ি দিয়েও খেতে ফার্স্টক্লাস লাগে। আরও একটু নিলে হত। ভটকাই বলল।

তারপর বলল, কত নিয়েছিস?

—দু'কেজি।

—বলিস কী? তার উপরে আরও নেবার কথা বলছিস।

— আরে খানেওয়ালাও তো কমতি নেই।

—ওতেই যথেষ্ট হবে। প্রয়োজন হলে রামপূজনকে কাল ডিরেকশন দিয়ে আবার পাঠালেই হবে।

—কালকে সিদ্ধু মিঞা আর এতদিনে ডাঙ্গু মিঞা ফিরলে ডাঙ্গু মিঞাও তোকে কী খাওয়াবার বন্দোবস্ত করেন দ্যাখ এখন। কান-কাটারা তো এতক্ষণে ফিরে গেছে।

— এত তাড়াতাড়ি! ভটকাই মিচকি হেসে বলল।

তারপরে বলল, ওরা হাজি মেহালে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তারপরে দ্যাখ হাসপাতালে গিয়ে থাকলে ডাক্তার সেখানে ভরতিই করে নিয়েছেন কি না! সত্যি! তুই যা করলি তা একেবারে গর্হিত অপরাধ।

— তাতো বটেই! আর জ্যান্ত পরমের মতো একটা মানুষকে বকর-ঈদের বকরীর মতো জবাই করে মারাটা খুব মহৎ কাজ, তাই না?

ততক্ষণে আমরা কুন্দ্রুগুটুর কাছাকাছি এসে গেছি। গাড়িটা গাছতলাতে পার্ক করাতে না করাতে ভটকাই চেঁচিয়ে ডাকল লছমন! কাঁহা গ্যয়া লছমন?

ঋজুদা বলল, লছমন রামপূজনকে নাস্তা দিচ্ছে।

— আরে রামপূজনকে আর খাওয়াতে মানা করো। এ ক'দিনেই পেটটা কত বড় হয়েছে দেখেছ?

— সে তো তোর পেটও বড় হয়েছে। তোরা খাবিও গান্ডে-পিন্ডে, তারপর পয়সা খরচ করে জিমে গিয়ে রোগা হবি। রামপূজন গরিব মানুষ একটু রেলিশ করে খাচ্ছে বেচারা, ওর পেছনে লাগলি কেন?

যাকগে আমাদের প্রণব মুখুয্যের লুচি আর সাদা আলুর তরকারি তাড়াতাড়ি দিতে বলো গরম গরম। তোমার জন্যে হাজারিবাগের বেঙ্গলি সুইটস থেকে রাবড়ি নিয়ে এসেছি। তুমি খেয়ে আমাদের একটু প্রসাদ দিলে আমরাও লুচি দিয়ে খেতে পারি ।

ঋজুদা বলল, তোদের দেখে মনে হচ্ছে তোরা যেন পিকনিকে এসেছিস— অফুরান পিকনিক।

তারপর বলল, এবার পরমের অন্ত্যেষ্টি কেমন হল বল।

—ও তোমার জন্যে ভটকাই কী এনেছে তা তো দেখতে পাবে না, তবে বর্ণনাটা শোনো একবার। সারা পৃথিবীতে ঘুরে তো অনেক কিছু খেয়েছ, কিন্তু মানুষের কান কখনও খেয়েছ? কানের চচ্চড়ি— কচকচ করে? বেশ ঝাল আর লেবু দিয়ে রান্না করা?

—কী বলছিস কী?

বললাম, ভটকাই-ই বলুক যা বলার।

ভটকাই বলল; জানতাম যে তোমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে। তাই আনলাম না কান দুটো। কানের মালিকদেরই উচিত ছিল তোমাকে কান দুটো নজরানা দেওয়ার। দিয়ে গেলে আমার ডিরেকশান মতো লছমন এমন করে রাঁধত কান দুটো যে প্রণববাবুর লুচি দিয়ে তা খেয়ে তুমি আহা! আহা! করতে।

ইজাহার সাহেব বললেন, আপনার ফিরে না আসা পর্যন্ত খেতাম কী করে আমরা! তাই এখনও নাস্তা করিনি। তবে আপনারা যা কাণ্ড-মান্ড করছেন তাতে এ যাত্রা আপনারা এখান থেকে নিজেদের প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়। কান দুটোর কিস্মত বহতই পড়ে যাবে। ডাঙ্গু মিঞাকে এমন বে-ঈজ্জৎ এর আগে কেউই করেনি।

কানের সঙ্গে প্রাণের তুলনা! প্রাণ তো সহজেই দিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু কানের চচ্চড়ি তো সহজে খাওয়া যায় না! তবে ডাঙ্গু মিঞাও তো জানেন যে আমাদের প্রাণ কইমাছের প্রাণেরই মতো, কঠিন। অত সহজে যাওয়ার নয়।

ঋজুদা লছমনকে বলল, জলদি নাস্তা লাগাও লছমন। বহত ভুখ লাগা হ্যায়। বাবুলোগ ইতনা দের করেগা কওন জানতা থা।

নাস্তার অর্ডার দিয়ে ঋজুদা ইজাহার সাহেবকে বলল, এখন কী করা হবে তা ঠিক করুন ইজাহার ভাই। কান-কাটারা তো সন্ধে সন্ধেতে পৌঁছে যাবে হাজি মেহালে।

কান কাটারা গিয়ে কী বলবে ওদের তা ওরাই জানে।

তারপর ভটকাইকে বলল, কান কাটলি তো দু'কানই কেন কাটলি না? দু কান-কাটা হলে ওদের দুজনকে দুজনে 'দু-কান কাটা' করে দিতে পারতিস। ডাঙ্গু মিঞা কি দুবাই থেকে ফিরেছে?

—আজও না ফিরে থাকলে ফিরবে তো বটেই। ফিরে এলেই তো সব জানতে পারবে।

কানগুলো ছোট ছোট। বুদ্ধদেবের মতো বড় বড় কান হলে কান কেটে আরাম হত।

বুদ্ধদেব মানে? বুদ্ধদেব গুহ? আমি বললাম।

ছ্যাঃ। শিবের সঙ্গে বাঁদরের তুলনা! কী যে বলো তুমি!

ঋজুদা বলল, গৌতম বুদ্ধর কান দুটো কি বড় বড় ছিল?

—তাও বুঝি লক্ষ করোনি। ভগবান বুদ্ধর যে কোনও মূর্তিই ভাল করে নজর করে দেখলে দেখতে পেতে যে তাঁর কান দুটো কত বড় বড়। অত বড় বড় কান বলেই তো উনি যা শুনতে পেতেন তা আমরা কখনও শুনতে পাব না। এমনিই কি শাক্যসিংহ বোধিলাভ করেছিলেন? অনেক শুনে এবং অনেক দেখে তবেই না উনি বোধিলাভ করেছিলেন।

ঋজুদা বলল, তোর অবজার্ভেশনের ক্ষমতা অসীম। এই তথ্য তো কখনও কারো কাছে শুনিনি আগে।

ভটকাইচন্দ্রর সঙ্গে অন্যদের তফাৎ আছে। চোখ থাকলেই কি সকলেই 'চক্ষুষ্মান' হতে পারে। ভটকাই বলল।

— ভটকাইচন্দ্রকে তুমি অন্য দশটা লোকের সঙ্গে তুলনা কোরো না। এমনকি তোমার অন্য চেলা রুদ্র রায়ের সঙ্গেও নয়।

আমি কিছু বললাম না। দু কান কাটা না হলেও এক কান কাটারা এখন কী কাণ্ড করবে কে জানে। ঋজুদার ব্যাপার-স্যাপারও বুঝি না। সাল্লু মিঞার অনুরোধে এমন করে ফেঁসে যাওয়ার কী দরকার ছিল তাও জানি না। এতো 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়া'। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে উলুখাগড়া মরে। এবারে ব্যাপারটা, বিশেষ করে ভটকাইয়ের বাড়াবাড়ির খেসারত আমাদের ভালমতোই দিতে হবে বলে মনে হচ্ছে। এই কুন্দ্রুগুটুর আস্তানা ছেড়েও আমাদের অন্যত্র পালাতে হবে বলে মনে হচ্ছে। আমাদের এই বাড়াবাড়িতে ব্যাপারটা রীতিমতো টোটাল ওয়ার-এ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সাল্লু মিঞার সঙ্গে ডাঙ্গু মিঞার শত্রুতাই শুধু নয়, ঋজুদা ডাঙ্গু মিঞাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, তাই ব্যাপারটা অনেকটা ব্যক্তিগত লড়াইয়েই পরিণত হচ্ছে। শুধু ফিজ পাওয়ার জন্যেই যে ঋজুদা এই লড়াইতে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে বলে আমার মনে হয় না। পরমের মৃত্যুর বদলা হিসেবে ভটকাই যা করল তা 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' হলেও আমাদের এতখানি জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন ছিল কি না জানি না। আমার বেশ চিন্তা হচ্ছে।

ঋজুদা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল, চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস একটা কথা বলেছিলেন, জানিস?

— না। কী কথা?

'If you pay evil with good what do you pay good with?'

বাঃ। dictum হিসেবে তাঁর বাণী তো অত্যন্তই ভাল। কিন্তু এই evil-এর সঙ্গে evil দিয়ে লড়াই করার পরিণাম কী হবে তা ভেবেই আতঙ্কিত হচ্ছি। দেশের ও বিদেশের নানা জায়গাতে আমরা অনেক যুদ্ধ জয় করে এসেছি, শেষে কি কলকাতার কাছের ঋজুদার পরম প্রিয় হাজারিবাগে এসে তীরে এসে আমাদের তরী ডুববে?

সত্যিই কী যে হবে নাটকের শেষ দৃশ্যে তা কে জানে! ⁂ *ক্রমশ*

ছবি : দীপঙ্কর রায়

অসাধারণ কিন্নর কল্পা

আবীর গুপ্ত

কল্পা কিন্নর লাহুল স্পিতি বেড়াতে যাব, এটা যাওয়ার কয়েক মাস আগেও কল্পনাতীত ছিল। হঠাৎ করেই সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। কালকা থেকে সিমলায় টয় ট্রেন শিবালিক এক্সপ্রেসে যাওয়ার পর সেদিন রাতে সিমলাতেই থাকতে হল। পরদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম সারাহানের উদ্দেশে। জায়গাটি সম্বন্ধে আগেই ইন্টারনেটে দেখে নিয়েছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও দেখার জায়গা যা যা আছে তার লিস্টও করে ফেলেছি। সিমলা থেকে সারাহান যাওয়ার পথে উপরি পাওনা কুফরি, ফাও আর নারকাণ্ডা। কুফরি আর ফাও-র সৌন্দর্য আমাকে সেসময়ে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু, পরে যখন সারাহানে গেলাম তখন এই দুই জায়গার কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। নারকাণ্ডায় হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের রেস্টুরেন্ট 'হাটু'তে লাঞ্চ সেরে নেওয়া হল।

নারকাণ্ডার পর থেকে রাস্তার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। একদিকে গভীর খাদ আর উপত্যকা। উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। শতদ্রুর নীল জল বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল কাশ্মীরের লিডার নদীর কথা। রাস্তার আরেকদিকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। কখনও কখনও পাথরের চাতাল মাথার উপরে ছাতার মতো বেরিয়ে আছে। তলা দিয়ে আমাদের বোলেরো যাওয়ার সময় প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল— ভেঙে পড়লেই ব্যস। কখনও কখনও রাস্তায় পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যেই সাবধান বাণী— 'ল্যান্ডস্লাইড জোন, গাড়ি আস্তে চালান।' রাস্তা এঁকেবেঁকে কখনও ইউ টার্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি বাঁকে পাহাড়ের সৌন্দর্যও বদলে যাচ্ছে।

সারাহানে পৌঁছলাম সন্ধ্যার সময়। কন্ডাক্টেড ট্যুরে হোটেল নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। নির্দিষ্ট হোটেলে ঢুকে পড়লাম। হোটেলটি বেশ ভাল এবং ভীমাকালী মন্দিরের ঠিক পাশে। এটি খুব বিখ্যাত মন্দির। প্রচুর তীর্থযাত্রী এখানে মন্দির দর্শনে আসেন। আমাদের প্ল্যান ছিল পরদিন সকালে মন্দির দেখে যাব মোনাল ব্রিডিং সেন্টারে। তারপর ওখান থেকে সময় থাকলে ভাষা উপত্যকা হয়ে চলে যাব সাংলায়।

বাণাসুরের কন্যা উষা একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন এক সুন্দর রাজপুত্র তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওই রাজপুত্রের সুন্দর পেশীবহুল চেহারা দেখে উষা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে ওঁর সখী চিত্রলেখাকে ওই রাজপুত্রের কথা বলে জানালেন, তিনি রাজপুত্রের প্রেমে পড়ে গেছেন। চিত্রলেখা উষার বিবরণ শুনে সেই অনুযায়ী ওই রাজপুত্রের ছবি এঁকে উষাকে দিল। উষা সেটি যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। উষার অবস্থা দেখে চিত্রলেখার দয়া হল। উষার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করল সমস্ত পৃথিবী ঘুরে সে ওই রাজপুত্রকে উষার কাছে এনে দেবে। এরপর বহুদিন কেটে গেছে। একদিন চিত্রলেখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছেলে অনিরুদ্ধকে দেখলেন। উষার বর্ণনার সঙ্গে অনিরুদ্ধর মিল খুঁজে পেয়ে তাঁকে ধরে আনলেন উষার কাছে। শ্রীকৃষ্ণ এত ঘটনার কিছুই জানতেন না। ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুনে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাণাসুরের রাজ্য আক্রমণ করলেন। বাণাসুর বুঝতেই পারছিলেন না হঠাৎ কেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হলেন। তখন সবাই জানতে পারলেন উষার স্বপ্নের কথা। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ছেলের সঙ্গে উষার বিয়ে দিলেন আর বাণাসুরের রাজ্য শোনিতপুর বাণাসুরকে ফেরত দিলেন।

পৌরাণিক গল্পের শোনিতপুরই বর্তমানে সারাহান গ্রাম। এই গল্পটি জেনেই সারাহানে গেছি তাই আরও ভাল লাগছিল। যদিও জানি পৌরাণিক কাহিনি গল্পই, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

হোটেলের সামনেই ভীমাকালী মন্দির। কাঠ আর পাথরের মন্দিরটি অসম্ভব সুন্দর। কিন্তু, এই মন্দিরটি ১৯০৫ সালে ভূমিকম্পে ভেঙে যায়। তাই, ঠিক এর পাশেই ১৯৪৩ সালে তৈরি হয় নতুন মন্দির। মন্দিরে ঢোকার সময় শুনছিলাম মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত পৌরাণিক কাহিনি। দৈত্যরা

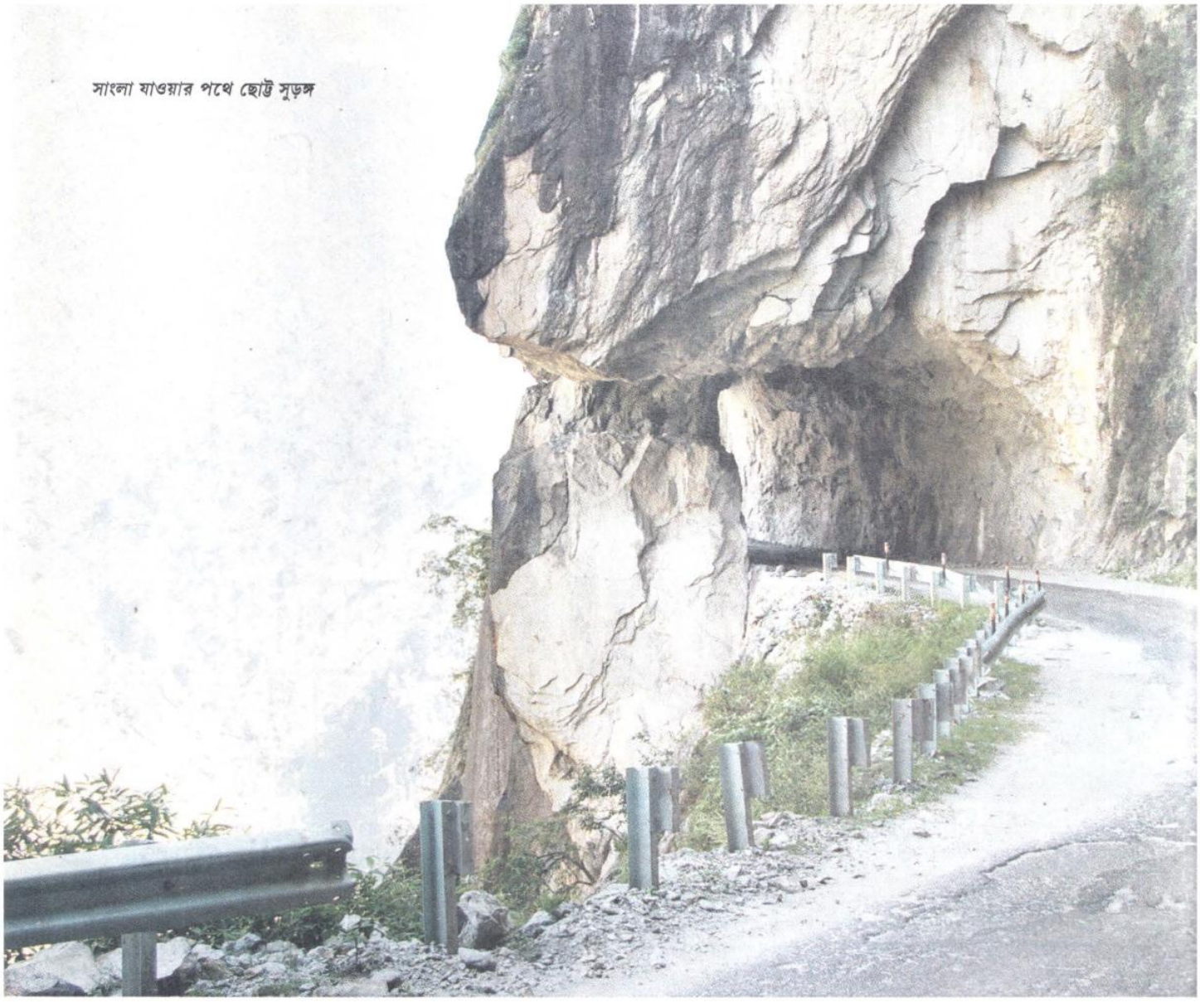

সাংলা যাওয়ার পথে ছোট্ট সুড়ঙ্গ

একসময় হিমালয়ের দেবতা আর ঋষিদের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। সবাই ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবানের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরোল আগুন, তৈরি হল বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড আর তার থেকে বেরিয়ে এলেন এক সুন্দরী যুবতী। তিনিই ছিলেন প্রথম শক্তি— আদি শক্তি। হেমকুণ্ড তাঁকে দিলেন সাদা বাঘ, যাতে তিনি বাহন হিসেবে সেটিকে ব্যবহার করতে পারেন, কুবের দিলেন মাথার মুকুট, বরুণদেব দিলেন তাঁকে তাঁর পোশাক আর অন্যান্য দেবতারা দিলেন তাঁকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। ব্যস, তিনি দৈত্য অর্থাৎ অসুরদের পরাস্ত করলেন। সারাহানে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভীমাকালী হিসেবে।

ভীমাকালী মন্দির দেখে প্রায় দু'কিমি পথ হেঁটে পাহাড়ে উঠে গেলাম মোনাল ব্রিডিং সেন্টারে। বহু আশা নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলাম হিমালয়ান মোনাল কেজন্ট পাখি দেখব বলে। এটির সংখ্যা পৃথিবীতে হাতে গোনা কয়েকটিতে এসে ঠেকেছে। হিমালয় ছাড়া কোথাও এদের পাওয়া যায় না। লুপ্তপ্রায় পাখি। তাই এদেরকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন ঘটিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। মোনাল কেজন্ট দেখলাম, ছবিও তুললাম, কিন্তু অসাধারণ সুন্দর ওই পাখিটিকে বন্দিদশায় দেখে মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। শুনলাম বাচ্চাদের বড় করার পর নাকি এদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। শুনে অবশ্য খুশি হয়েছিলাম।

দুপুর বারোটা নাগাদ সারাহান ছেড়ে রওনা দিলাম সাংলার উদ্দেশে। সারাহান হচ্ছে কিন্নর ঢোকার মূল ফটক। পথে 'ওয়েলকাম টু কিন্নর' লেখা স্টোন দেখে বুঝে গেলাম কিন্নরে ঢুকে পড়েছি। পথ ভাল-খারাপ দুরকমই। কোথাও পাথরের চাতাল মাথার উপর ছাতার মতন হয়ে আছে। কোথাও বা ছোট্ট সুড়ঙ্গের মতন। রাস্তা পিচ বাঁধানো সব জায়গায় নয়, কোথাও নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে বোলেরো চলছিল। তখন মাঝে মধ্যেই বোর্ডে লেখা চোখে পড়ছিল, 'সরি ফর উঃ আঃ আউচ্' বা 'স্মাইল ইজ আ ট্যাক্স ফ্রি আইটেম'। দু'পাশের নৈসর্গিক দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। রাস্তা সরু, একটা গাড়ি যাওয়ার মতন। প্রতিটি বাঁকে দৃশ্যের পরিবর্তন হচ্ছিল। পাহাড়-পর্বত তার রূপ বদলাচ্ছিল। কখনও বড় বড় গাছে ঢাকা পর্বত, কখনও ছোট ছোট গাছ। রাস্তার একদিকে গভীর খাদ, নিচে অসাধারণ শতদ্রু নদী আর অন্যধারে খাড়া পাহাড় সোজা উঠে গেছে। পেশায় ভূতত্ত্ববিদ হওয়ায় পাথরগুলোকে চিনতে পারছিলাম আর আঁতকে উঠছিলাম। লাইমস্টোন, স্যান্ডস্টোন আর নানারকম আগ্নেয়শিলা। লাইমস্টোন আর স্যান্ডস্টোনগুলো যেখানে রাস্তার দিকে কাত হয়ে আছে সেখানেই ভয়, যখনতখন ধস নামতে পারে। মনে মনে ভাবছিলাম, এখনই এই, পরে স্পিতিতে ঢুকলে কী হবে? শুনেছি ওখানকার রাস্তা নাকি সাংঘাতিক।

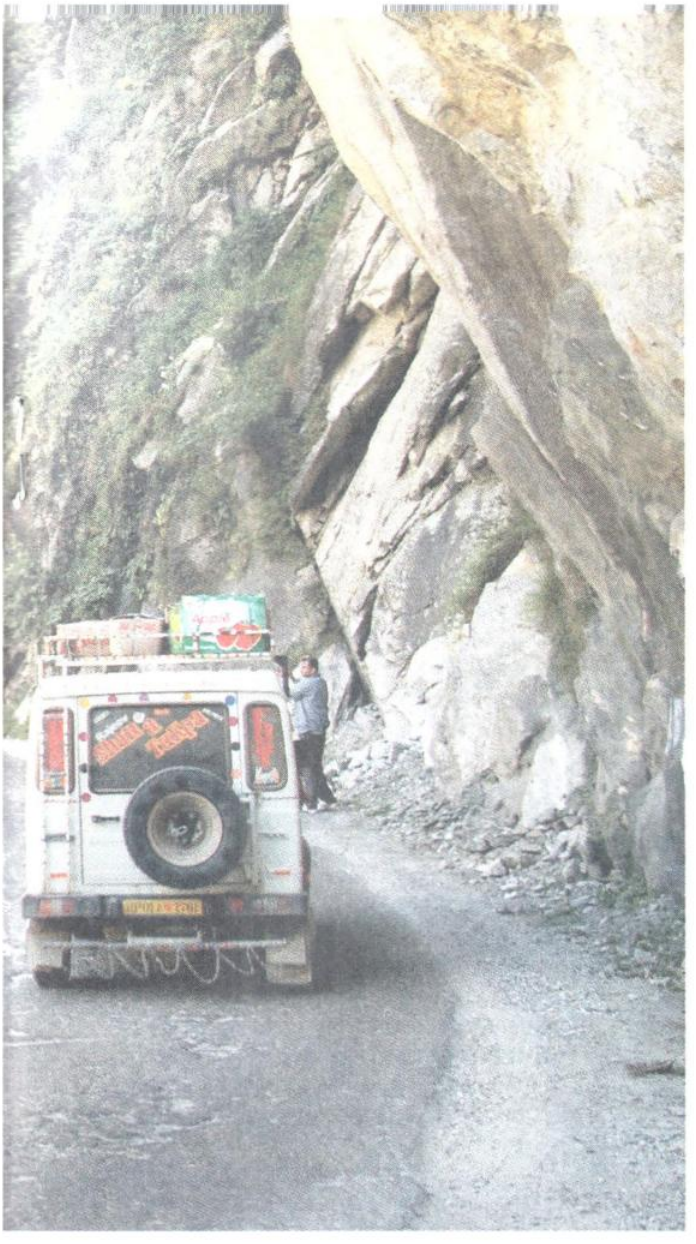

পথের দু'পাশে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে আপেল গাছ, বাগান আর গাছে এত আপেল ফলে আছে যে গাছ থেকে পেড়ে আপেল খাওয়ার ভয়ানক লোভ হচ্ছিল। আমার দুই ছেলে আপেল ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য পাগলের মতন বায়না করছে। এর মধ্যে রাস্তায় নাথরা ঝাকরি হাইড্রাল প্রজেক্টও অতিক্রম করেছি। এটি শতদ্রু নদীর উপর তৈরি। পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ করে ভিতরে এলাহি কাণ্ডকারখানা যে হচ্ছে বাইরে রাস্তা থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল। সাংলা পৌঁছনোর চোদ্দ-পনেরো কিমি আগে একটি বিশাল আপেল বাগান দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য, বাগানের মালিককে অনুরোধ করে কয়েকটি আপেল গাছ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। আমিই বাগানে ঢুকলাম। চার-পাঁচজন তরুণী চেয়ার-টেবিলে বসে কোনও তরল পদার্থ গ্লাসে করে খাচ্ছিলেন। দারোয়ান একজনকে দেখিয়ে বলল, উনিই মালিক। সোজাসুজি হিন্দিতে বললাম, 'আমরা বাঙালিরা কলকাতায় ৭০/৮০ টাকা কেজিতে আপেল কিনি। কিন্তু গাছ থেকে ছিঁড়ে খাওয়া কোনওদিন হয়নি। যদি সেই অনুমতি দেন, তার বদলে ওই আপেলের জন্য যা দাম চাইবেন দেব।' ড্রাইভার বা গ্রামের লোকেরা আগেই জানিয়েছিল আপেল বাগানের মালিকরা আপেল ঠিকাদার ছাড়া কাউকে দেয় না। তবুও একটা চেষ্টা— এতটা অপমানিত জীবনে হইনি। আমাদেরকে বিশ্রী ভাষায় অপমান করে বার করে দিয়েছিলেন তাঁরা। সম্ভবত তাঁরা তখন অর্ধমাতাল অবস্থায় ছিলেন। ছেলেদেরকে বোঝালাম, 'আপেল ফল টক।' ভারাক্রান্ত মনে সাংলায় পৌঁছলাম।

হোটেল ত্রিদেব ভগতি রিজেন্সির মালিক বাঙালি, সঞ্জয় সরকার। ওঁর কর্মচারীরাও বাঙালি, পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। হোটেলের ঘরগুলি এত ভালমানের যে আপেলের দুঃখ ভুলেই গেলাম। রাতে সেই পরিচিত বাঙালি রান্নার স্বাদও পেলাম।

সাংলা গ্রামটি বেশ বড় আর বর্ধিষ্ণু। সাংলা বা বসপা উপত্যকার এই গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর। আর বসপা নদীর সৌন্দর্য যে কোনও গোমড়ামুখো মানুষকেও খুশিমুখো করে দেবে।

ভোর সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্য ছিল রক্সম্ হয়ে ছিটকুল। তারপর ওখান থেকে ফিরে সাংলার কামরু ফোর্ট আর নাগা মন্দির দেখা। সাংলা ৮৯০০ ফুট উঁচু হলেও ছিটকুল কিন্তু ১১,০০০ ফুটের মতো (৩৪৫০ মিটার) উঁচু। পথে অতিক্রম করতে হবে ৫২৪২ মিটার উঁচু চরং পাস আর রক্সম গ্রাম।

রক্সম ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। রাস্তার পাশ দিয়ে বসপা নদী বয়ে যাচ্ছে। বসপা উপত্যকা এত সুন্দর যে মাঝেমাঝেই মনে হচ্ছিল ওখানেই থেকে যাই। ছিটকুল পৌঁছে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এত সুন্দর যে কোনও জায়গা হতে পারে— বসপা নদী গর্জন করতে করতে বয়ে চলেছে, দু'পাশে বরফে ঢাকা পাহাড়, নীল আকাশ, আর কিছু পাহাড়ি পাখির মিষ্টি ডাক। তার মাঝে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমরা ক'টি প্রাণী। এ কোথায় এসেছি! দুবার কাশ্মীর গেছি, পহেলগাঁওতেও একবার দশদিন থেকেছি। লিডার নদীর সৌন্দর্যও উপভোগ করেছি। কিন্তু ছিটকুল? ছিটকুলে লাঞ্চ করলাম যে ধাবায় তার গায়ে লেখা ছিল, 'হিন্দুস্তান কি আখরি ধাবা।'

সাংলায় পৌঁছে প্রথমেই গেলাম নাগা মন্দিরে। পথের সৌন্দর্য বেশি না বলাই ভাল। ওখান থেকে কামরু ফোর্ট। গাড়ি পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকটা পথ সিঁড়ি দিয়ে উঠে পাহাড়ের মাথায় ফোর্ট। সিঁড়ির পাশে সারি দিয়ে আপেল গাছ। আপেলের দিকে তাকাতে না চাইলেও চোখে পড়ে যাচ্ছিল। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় কী? অবশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় কামরু ফোর্টে পৌঁছলাম। অসাধারণ দৃশ্য— নিচে দিগন্ত বিস্তৃত সাংলা উপত্যকা। চারপাশে পর্বতের সারি, বরফে ঢাকা চূড়া। পর্বতের কোনওটি আবার ছুঁচালো। ফোর্টের ভিতরে মন্দিরও আছে। ঢুকতে গেলে কিন্নরি টুপি পরে আর কোমরে দড়ি বেঁধে ঢুকতে হয়। এটাই নিয়ম। ওখানেই প্রথম দেখলাম ব্রহ্মকমল ফুল। এই ফুল ছাড়া নাকি পূজা হয় না! আগের দিন পূজা হয়েছে, মন্দিরে বাসি ব্রহ্মকমলের ছবি তুলতে দেখে ওখানকারই একজন আমার ছোট ছেলেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুটি ব্রহ্মকমল ফুল ওর হাতে গুঁজে দিল। তখনই জানলাম ওই ফুল ১৬,০০০ ফুট উচ্চতায় হয়। পূজা বলে ওই ফুল আগের দিন পর্বত চূড়ায় উঠে কয়েকজন নিয়ে এসেছেন। দুটি ফুল বেশি ছিল, পূজায় লাগেনি। আমার ছোট ছেলেকে দেখে ওঁদের ভাল লেগেছে বলে ফুল দুটি দিয়ে দিয়েছেন। এত কষ্ট করে আনা ফুল এভাবে— আপেলের দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম। আর তারপর? সাংলার স্মৃতি কোনওদিনই ভুলতে পারব না।

ফোর্ট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, একজন বৃদ্ধা মহিলা, পিঠে ঝোলায় নাতি ঝুলছে, হাতে একটা বড় প্যাকেট— আমাদের ডাকছেন। কাছে যেতেই হাতে তুলে দিলেন প্যাকেটটা— গোটা দশ বারো আপেল রয়েছে তাতে। আমাদের উপরে ওঠার সময় দেখে, কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিলেন সবই। তাই, ওঁর বাগানের আপেল গাছ থেকে আপেল পেড়ে আমাদের জন্য এনেছেন। আমরা আপেলের দাম দিতে চাইলে তিনি টাকা নিতে অস্বীকার করেন। আমাদের একজন দৌড়ে উপরে ফোর্টের কাছে একটি ছোট্ট দোকান থেকে একটা বড় বিস্কুটের প্যাকেট কিনে আনল। ওঁর হাতে দিতেই, টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ওঁর বাড়িতে। ছোট্ট কুঁড়েঘর, সামনে বাগান, বাগানে গোটা পাঁচেক আপেল ভর্তি আপেল গাছ। গাছ থেকে আপেল পেড়ে খেতে বললেন। গোটাপাঁচেক আপেল ছিঁড়ে প্রত্যেকে কামড় দিলাম— মনে হল অমৃত।

আমাকে সবসময় শুনতে হয় আমি নাকি কঠিন হৃদয়ের— আমার চোখেও সেদিন জল এসে গিয়েছিল। কোটিপতির কাছে পেলাম অপমান আর যাঁর কিছুই নেই— তাঁর থেকে যা পেলাম তা কি জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারব? ভাগীরথী বহিন তাঁর ছোট্ট নাতিকে পিঠে নিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন এখনও মানুষের মধ্য থেকে মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়নি। হয়তো এভাবেই সর্বত্র ওঁদের মতো মানুষের মধ্যে তা টিকে আছে।

সাংলা থেকে কল্পার উদ্দেশে রওনা হলাম এক সুন্দর স্মৃতি নিয়ে। ভাগীরথী বহিনকে কি জীবনে ভুলতে পারব? গাড়িতে আলোচ্য বিষয় ছিল এটিই। পথের সৌন্দর্য দেখব কী, বারবার মনে পড়ছিল ওঁর বলিরেখা ভরা মুখটি। দু'পাশে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন ঘটছে দৃশ্যের। আগে রাস্তার পাশে পাশে চলছিল বসপা নদী। এরপর এসে গেল শতদ্রু নদী তার সৌন্দর্য নিয়ে। এক জায়গায় বোলেরো দাঁড় করিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। একের পর এক রেঞ্জ আর তার মধ্য দিয়ে শতদ্রু নদী নিজস্ব ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে— অবশ্যই আমাদের বহু নিচ দিয়ে। আমাদের রাস্তার একদিকে গভীর খাড়া নেমে যাওয়া খাদ আর আরেক দিকে সোজা খাড়াভাবে উঠে যাওয়া পাহাড়। পাথর হল স্যান্ডস্টোন আর কনগ্লোমারেট। কয়েক জায়গায় লাইমস্টোনও চোখে পড়ল।

কামরু ফোর্ট

কখনও পাথরের স্তরগুলো কাত হয়ে আছে রাস্তার দিকে। মাঝেমধ্যেই তাই লেখা আছে 'ল্যান্ডস্লাইড জোন'। গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা শুধু নয়, অর্ধেক দেহ বার করে চলন্ত গাড়ি থেকেই তুলে যাচ্ছি একের পর এক ছবি। এ কোথায় এসেছি! এরকম দৃশ্য! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বোধহয় স্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভাঙলেই দেখতে পাব নিজের বাড়ির পায়রার খোপের মতন ছোট্ট দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরে শুয়ে আছি।

রকছম হয়ে রেকং পেও গ্রামে পৌঁছলাম সকাল এগারোটা নাগাদ। রেকং পেও কিন্নর জেলার হেড কোয়ার্টার। গ্রামটি বেশ বড়, প্রচুর দোকানপাট। একটা বিশাল স্টেডিয়ামের মতন চত্বরও চোখে পড়ল সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসের পাশে। একটা ফাঁকা মাঠ যার চারপাশে গ্যালারি আর একদিকে বাঁধানো বিশাল বড় মঞ্চ। বুঝলাম নানারকম অনুষ্ঠানের জন্যই ওটা করা। একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টও চোখে পড়ল। ওখানে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রচুর সোয়েটার আর শালের দোকান দেখে কয়েকটিতে ঢুকে দাম জিজ্ঞাসা করে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। ট্যুরিস্ট বলে অত্যন্ত বেশি দাম চাইছে।

লাঞ্চের পর শুরু হল আবার পথচলা। সাংলা থেকে কল্পার দূরত্ব মোটামুটি ৬০ কিমির মতো। রেকং পেওর কাছে প্রায় একশো বছরের পুরনো তিব্বতি মনাস্ট্রি আছে। সেটিকে দেখে রওনা দিলাম কল্পার উদ্দেশে। রাস্তাতেই খেয়াল করলাম আকাশ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কল্পায় পৌঁছে পরদিন কল্পা ছেড়ে রওনা দেব নাকো টাবো আর কাজার উদ্দেশে। ওই রাস্তা শুনেছি বেশ খারাপ আর অধিকাংশ সময় নাকি ধস টস নেমে বন্ধ থাকে। দিন সাতেক আগে বন্ধ রাস্তা খুলেছে। বৃষ্টি নামলে কী হবে?

কল্পায় পৌঁছলাম বিকেলবেলায়। আমাদের হোটেলের সামনেই পুরো কিন্নর-কৈলাশ রেঞ্জ। এই রেঞ্জের গড় উচ্চতা ৬০৫০ মিটার। সবচাইতে উঁচু চূড়া হল কিন্নর কৈলাশ (৬৫০০ মি)। এর পরেরটি হল জোরকাদান (৬৪৭৪ মি)। আরও দুটি উল্লেখযোগ্য চূড়া হল ফাওয়ারঙ (৬৩৪৯ মি) ও সারো (৬০৮০ মি)। এসব হোটেলের ম্যানেজারই বলছিল। অবাক বিস্ময়ে বরফে ঢাকা কিন্নর-কৈলাশকে দেখছিলাম। পাশেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে শিবলিঙ্গকে। এখান থেকেই সবচেয়ে ভাল দেখা যায় শিবলিঙ্গটিকে। ঝটপট বাইনোকুলার বার করে চোখে লাগাতেই একদম 'থ' মেরে গেলাম। অদ্ভুত রং পাথরটার, মনে হল রঙও বদলাচ্ছে। পাশে আরও একটি শিবলিঙ্গ যার চূড়াটা একটু বাঁকা। ম্যানেজার পাশে দাঁড়িয়ে চূড়াগুলি চেনাচ্ছিল। বলল, এটাই নাকি শিবের বাড়ি। শীতকালে এখানে চলে আসেন নিশ্চিন্তে ধ্যান করার জন্য। শিবলিঙ্গ নাকি ওঁরই প্রতীক। শুনছিলাম আর ঘড়ি দেখছিলাম— এখুনি বেরিয়ে পড়া দরকার। ঝটপট মালপত্র হোটেলে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া হল। শুনেছিলাম রোঘি আর চিনি গ্রাম দুটো নাকি খুব সুন্দর। কল্পার উচ্চতা ১০, ৯০০ ফুট বা ৩৩০০ মিটার। রোঘি আর চিনি ওর থেকে অল্প উঁচুতে। রোঘি মাত্র ৪ কিমি দূরে।

রোঘি গ্রামটা গাড়ি নিয়েই ঘুরলাম। প্রচুর আপেল বাগান। দু-এক জায়গায় আপেল বাক্সে ভরে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। রাস্তা বেশ সরু। গ্রামে একটা মন্দিরও আছে। দূর থেকেই মন্দিরটা দেখলাম। কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি। সময়াভাব, তাই মন্দিরে গিয়ে সময় নষ্ট না করে চলে গেলাম চিনি গ্রামে। এ গ্রামটি আরও ছোট কিন্তু সুন্দর। দুটি গ্রামই ছবির মতো। শান্ত সুন্দর নির্জন পরিবেশ যে কারও ভাল লাগবে। এখানে থাকার জায়গা কিন্তু চোখে পড়ল না। থাকতে হলে কল্পাতেই থাকতে হবে।

অন্ধকার হওয়ার আগেই কল্পার হোটেলে ফেরত চলে এলাম। হোটেলটা একটা বিরাট আপেল বাগানের মধ্যে। বারান্দার সামনে সারি দিয়ে আপেল ভর্তি গাছ। ইচ্ছে হলেই হাত বাড়িয়ে দু-একটা পেড়ে নেওয়া যায়। সামনে কিন্নর কৈলাশের তখন ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। হঠাৎ ঝুপ করে নেমে এল অন্ধকার। আর তারপরেই শুরু হল মুষলধারায় বৃষ্টি। বৃষ্টি না কি শিলাবৃষ্টি? টুপটাপ করে শিল পড়ার আওয়াজ পাচ্ছি। মনে আতঙ্ক, সকালে যদি দেখা যায় নাকো টাবোর রাস্তায় ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে কী হবে? ⌘⌘

ব্যাকপ্যাক

১। হোটেল বুকিংয়ের জন্য:
সারাহান— হোটেল শ্রীখণ্ড, ফোন- (০১৭৮২) ২৭৪২৩৪; সাগরিকা, ফোন- ৭৪৪৯১, ০৯৪১৮৩৪২৯৯৯।
সাংলা— ত্রিদেব ভগবতী রিজেন্সি, ফোন- ৯৪১৮১২৮৩৪১, ৯৮০৫৮৪১৮৭৬।
কল্পা— দ্য কিন্নর কৈলাশ, ফোন- (০১৭৮৬) ২২৬১৫৯।

২। উচ্চতাজনিত শ্বাসকষ্ট এড়ানোর জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কোকা-৩০ দিনে ৩ বার করে খান। বমির জন্য কক্কুলাস-৩০ খেতে পারেন।

৩। প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখবেন। ওষুধের দোকান কোথাও পাবেন না।

গল্প

সাময়িক সংলাপ

কানাই কুণ্ডু

রাস্তায় বেরোলে মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হয়। চেনা মানুষ হলে ভাল লাগে। মানুষটিও উৎসাহে কথা বলতে চায়। কথা অর্থাৎ প্রশ্ন: কেমন আছিস। কবে এলি। থাকবি ক'দিন। বিয়ে করেছিস ইত্যাদি। সবই একতরফা।

উত্তরে কিছু বলতে গেলেই ছট ফট করি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আছিস তো। যাব একদিন।

অচেনা বা আধাচেনা হলে অন্ধকার হাতড়ানো। তখন সব আলোর কণাই উজ্জ্বল। যেটা সঠিক ভেবে ছোঁয়, সেটাই ভুল। লজ্জা পেতে হয়। মনে কাঁটা ফোটে। খচখচ করে। অস্বস্তি। অচেনা মানুষটি তবু নাছোড়। নিজেকে চেনাতে চেষ্টা করে, সেই যে সেই সেন্ট জেভিয়ার্স... এইটটি ফাইভের ব্যাচ... সেই যে অনুপম চ্যাটার্জি, তোর ন্যাওটা বন্ধু...

ওড়া স্মৃতির তুলোয় চোখ ভাসানো। খোঁজার চেষ্টা। সেন্ট জেভিয়ার্স এবং এইটটি ফাইভ মিলে গেলেও, অনুপম মেলে না। কোনও ছবি ভেসে ওঠে না। এমনকি সে বছর ক্লাসে অনুপম নামে কেউ ছিল কিনা মনেও পড়ে না। বাধ্য হয়ে বলতে হয়, সরি। ঠিক প্লেস করতে পারছি না।

তবে থাকতেও পারে। অন্য কোনও বছরে। অন্য কোথাও। হয়তো প্রেসিডেন্সিতে। কম দিন তো নয়। জন্ম থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত কলকাতায়। বাবা-মা-আত্মীয়-বন্ধু। আবাল্যের স্মৃতি। কত ভাঙা গড়া। কত প্রাপ্তি। প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চ। হারানো ভালবাসার টানে বারবার ফিরে আসা। এবং এভাবেই একদিন পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে হঠাৎ দেখা। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নানা মানুষের চলাচলের মাঝে ঠিক চিনেছিল, নৈরী না?

প্রকীর্ণ!

তাছাড়া তোকে নৈরী নামে কে ডাকবে?

বাব্বা! একযুগ পরে দেখা।

তোরা পাড়া ছেড়ে যাবার পর আমি বার তিনেক এসেছি।

একবার গিয়েছিলাম পাড়ায়। তুই তখন বিদেশে। আর চেষ্টা করিনি।

সময় হবে? চল কোথাও বসি।

ছোট চৌকো টেবল। দু'পাশে চারটে চেয়ার। দুজনে মুখোমুখি। গ্লাস তুলে চুমুক দেওয়ার আগে প্রকীর্ণ বলে, কেমন আছিস?

লম্বা শ্বাস ছাড়ে নৈরীতা। সামনে তাকিয়ে বলে, এখন আমি মুক্ত বা বেপরোয়া। যা খুশি করতে পারি। তোর হাত ধরে বেরিয়েও যেতে পারি।

একটু দেরি করে ফেললি, মাথা নামায় প্রকীর্ণ।

মানে!

এই কথাটা শোনার জন্যে পাঁচ বছর আগে এক আকাশরাঙা বিকেলে ভিখিরির মতো হাত পেতেছিলাম।

আমি না বলেছিলাম!

তুই তখন নিলয়ের মাঝ আকাশের সূর্য। ঝলকানির তীব্রতায় ধাঁধার ঘোর ছিল তোর। চিনতে চাসনি। মুচকে হেসেছিলি। হাসিতে অবজ্ঞা ছিল।

ওহ নিলয়! তুই জানিস, ও কী করেছে?

আগ্রহ নেই।

অর্থাৎ আমার ব্যাপারে আর কোনও আগ্রহ নেই।

আগ্রহ অসীম।

তাহলে!

ওই যে বললাম, দেরি করে ফেললি।

বিয়ে করেছিস?

সেই জন্যেই তো হাত পেতেছিলাম।

এখনও ব্যাচেলার?

বলতে পারিস।

অথচ দেখ, আমরা দুজনে দুজনকে অনেক দিন থেকে চিনি। ভালবাসি। অনেক বছর আগের একটা গুমোট বিকেল আমার প্রায়ই মনে পড়ে। দৃশ্যটা যেন দেখতে পাই। বিশেষত রাত্রে। বিছানায় শুয়ে ঘুমের আগে। অথবা কিছুতেই ঘুম না এলে। তুই তখন কী যেন একটা গান গাইছিলি। তোর গলা একটুও ভাল না। তবু পুকুরের সেই নিস্তরঙ্গ স্থির জল। ধুসর পাখিহীন মেঘহীন খোলা আকাশ। স্তব্ধ গম্ভীর গাছপালা। আর তোর ওই উদাসী ভেসে আসা গান আমাকে বিহ্বল করেছিল। ওই গান, ওই পরিবেশ বা ওই নির্জনতার একলা তুই, কোনটা বেশি আকর্ষণীয় ছিল জানি না, পেছন থেকে আমি তোকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। শাড়ি সালোয়ারের বয়স হলেও আমি তখনও স্কার্ট আর টপ পরতাম। আমি তোর ঠোঁটে হাত রেখেছিলাম। তখন একটা ফড়িংও ছিল না। গাছের পাতাও স্তব্ধ ছিল। আর তুই দস্যুর মতো আমাকে কোলে তুলে নিলি। আবেগে চুমুতে বিবশ করে দিলি। কিছু বলার সময় দিলি না। পরিতৃপ্ত মনে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আমার প্যান্টি ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেটাই ছিল আমার লস অব ভার্জিনিটি।

এমন বিন্যাসে আউড়ে গেলি, যেন কবিতার লাইন।

তোর কবিতা মনে হতে পারে। কিন্তু এটা বাস্তব। একটুও রং চড়ানো নয়। আমি আমার নিঃশঙ্ক মনের অবস্থা প্রকাশ করলাম।

কিন্তু সেটা তো অনেক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটা বিকেল।

আমি সেটাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চাই প্রকীর্ণ।

হঠাৎ এতদিন পরে। তুই কি একা?

বলতে পারিস। তবে নিঃসঙ্গ নয়। অর্ণব আছে। আমরা কল সেন্টারে নিশীথ-সঙ্গী ছিলাম। কাজ আড্ডা পান-ভোজন থেকে হঠাৎ জীবনে। তার আগে অনীশ। বেচারা! ওর জন্যে আমার কষ্ট হয়। এখনও খাঁটি আদর্শবান। সভ্য ভদ্র ভালমানুষ। ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। আমি চলে যাচ্ছি, বলায় যেমন প্রতিবাদহীন সম্মতি পেয়েছিলাম, তেমনি আমি ফিরে এলাম, বলে হাজির হলেও আপত্তি থাকবে না। তবে অর্ণব অনেক প্রাণবন্ত। জীবন যেন উপচে পড়ছে।

এমনি তো তোর পছন্দ।

আর নেই। সেই উপচে পড়া ঢেউ এখন বালিয়াড়ি। সে কেবল নুড়ি পাথর খুঁজে বেড়ায়। আবিষ্কারের নেশায় নাপিতের মতো সব সময় হাতবাক্স নিয়ে বসে থাকে। থিওরি লেখে। স্টিভ জোবসের ভক্ত।

একসঙ্গে থাকিস না তোরা?

তুই তো দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াস। ইজিপ্টে গেছিস কখনও? আমিও যাইনি। না গেলেও মমির কথা নিশ্চয় জানিস। আমরাও মমি। পাশাপাশি এবং এক বিছানায়। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ কথা বলি না। তুই যেটা জানতে চাইছিস ... সেক্সচুয়্যাল আর্জ ... হ্যাঁ আছে। বেড পার্টনার, উইদাউট রিলেশন।

তোর সঙ্গে যদি আজ হঠাৎ দেখা না হত?

থাকতাম, যেমন আছি। লোকে যাকে বেঁচে থাকা বলে। অথবা এটাই মরণ কিনা জানি না বলে।

এটা তো হতাশা। ফ্রাস্ট্রেশন।

এটাই রিয়্যালিটি।

না না। মানুষের স্বপ্ন থাকে। স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে।

সেটা তো শীতের রাতের লেপ-ঘুম। সাময়িক স্বস্তি। এই যেমন তোকে দেখে আমার একটা ইচ্ছে প্রবল হচ্ছে। তুই আমাকে ভালবাসিস। আর আমি তোকে এত গভীর ভালবাসি যে নিজেকে ভয় পাই। তুই এসে দাঁড়ালে, অতি প্রিয়তর মানুষকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা থাকবে না।

কিন্তু আমি তো তেমন বিশিষ্ট নই।

তুই আমার প্রথম ভালবাসা। আমার চৈতন্যের উন্মেষ। আমার জীবনের মুগ্ধ সকাল।

তাহলে ফিরিয়ে দিয়েছিলি কেন?

তখন আমি মা-বাবার মেয়ে। নৈরীতা হয়ে উঠিনি। আমার বাবা-মার একান্ত পছন্দের নিলয় আমাকে ঠোকরাচ্ছে। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার। থিয়েটার রোডে চালু নার্সিংহোম। তুই তখন যাদবপুরে ইলেকট্রনিক্সের ফাইনাল ইয়ারে। অবজ্ঞাটা কি অস্বাভাবিক!

তাহলে এখনও এই গোপন ইচ্ছা?

আমি কি তোকে বোঝাতে পারছি না, না কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

যদি মেনেও নিই, তবে আমার... বলতে বলতে থেমে যায় প্রকীর্ণ। বলে, আর একটা নিবি তো।

বল।

তুই কিন্তু একটু ফাস্ট।

পরেরটা লং করে খাব।

আঙুলের টুসকিতে বেয়ারা আসে। গ্লাসে সোডা বরফ ঢালতে এলে প্রকীর্ণ এবারও না করে। নৈরীতা প্রসঙ্গে ফেরে, আমাদের কিছু হওয়ার আগে বাবা স্ট্রোকে। তিন মাস পরে মা ভাবনায় এবং শোকে। নিলয়ের বাবা তথা নিলয় আমাদের অভিভাবক। মাঝে মাঝে আমাকে একা ডিনারে নিয়ে যেত। সেদিনও এসেছিল। গাড়িতে উঠলাম। বোনেরা ফ্যাল ফ্যাল করে দেখল, যেমন দেখত। উৎসাহ দিত। কিন্তু সেদিন আর ফেরা হল না। সাক্ষী, উকিল ঠিক করা ছিল। বিয়ে হল আমার। লিখিত। মা-বাবা মারা যাওয়ার কারণে কাল-অশৌচ। আনুষ্ঠানিক বিয়ে এক বছর পরে। আর এই এক বছরে আমার দুবার অ্যাবরশান। এবং নিলয়ের নার্স কেলেঙ্কারি। এমনকি একরাত থানায় আটক।

ব্যস। এতেই তুই খেপে গেলি!

ঠিক উলটো। আমার কোনও রি অ্যাকশন ছিল না। কারণ নিলয়ের একস্ট্রা নার্স-অ্যাফেয়ার আমি জানতাম।

তাহলে?

অভিযোগের আঙুল উঠল আমার দিকে। আমার না কি নিশ্চয় কোনও প্রাক্তন আছে। নিলয়ের প্রতি আগ্রহহীন। বাবা-মার অনুগত শিশু নিলয়। প্রশ্রয়ের পুরোপুরি সুযোগ নিল। নার্সিংহোম লাগোয়া অ্যাপার্টমেন্টে প্রায়ই তার রাত্রিবাস জরুরি হয়ে পড়ত।

পরপর দুটো চুমুক দিয়ে নৈরীতা বলে যায়, অপমান অবজ্ঞা দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারলাম না। বাড়ি ফিরে এলাম। সেপারেশনের মামলা করলাম।

নিলয় ... মানে, তোর স্বামী রাজি হল?

এতে তার সুবিধেই করে দিলাম। তার পছন্দের নার্সকে নিয়ে পাকাপাকি থাকায় বাধা থাকল না।

তা হলে, তুই এখন সমস্যায় ভারাক্রান্ত।

ঢক করে লম্বা চুমুক দিয়ে চোখে বারুদ ছড়ায় নৈরীতা। ব্যঙ্গ করছিস।

টেবলে পেতে রাখা তার অন্য হাতটা খপ করে ধরে প্রকীর্ণ। বলে, ভুল বুঝিস না। সহানুভূতিতে কাতর হয়ে পড়ছি।

অনেকদিন পর তোর স্পর্শ পেলাম। আগের মতোই, অনুভূতিময়।

অনুগৃহীত হলাম।

অনীশও খানিকটা তোর মতো। ভালবেসেছিলাম। বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অনীশ ভালবাসা বোঝে না। কিছু স্নাবর বা লাজুক মানুষ আছে না, ব্রথেলে যায় না। কল-গার্ল বা ডান্স ফ্লোরের মেয়েদের পছন্দ করে না। একটা বউ অথবা নির্দিষ্ট মেয়ে চায়। যে সেজেগুজে কেবল তারই জন্যে অপেক্ষা করবে। হল না ... পালিয়ে এলাম। আর অর্ণব? এক্সপ্রেশনলেস যন্ত্র। বা একটা রোবট!

আমাকে এসব শোনাচ্ছিস কেন?

অনেকদিন তোর মতো কাউকে পাইনি। ভেতরটা খুলে দেখালাম। মনটা হালকা হল।

নে শেষ কর। এবার উঠতে হবে।

তোর কোনও কথা নেই প্রকীর্ণ? কিছুই তো বললি না।

গ্লাস উপুড় করে প্রকীর্ণ উঠে দাঁড়ায়। বিল-প্যাডে টিপস সহ টাকা গুঁজে নৈরীতার হাত ধরে তোলে। বলে, আমিও তো এই সময়ের মানুষ। একজন নিলয় বা অনীশ বা অর্ণব ... বা ওই রকমই কেউ। ⌘⌘

ছবি : দীপঙ্কর রায়

দাউ দাউ গরমের পরেই রিমঝিম বৃষ্টি। শরীরে-মনে আনে তৃপ্তির আমেজ। প্রকৃতি তার ঝলসানো রূপ ধুয়ে মুছে সুবজের মোড়কে সাজায় নিজেকে। এত ভালোর মধ্যে কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। যেমন, চুলের নানা সমস্যা। চুল ছোট হোক বা বড়, কী করে এই ঋতুতেও তা ঝলমলে রাখবেন তার-ই কথা এবারের পাতায়।

রূপটান

বর্ষায় চুলের যত্ন

বৃষ্টি পড়লেই টাপুর ভিজবে। অঝোর ধারা বা ইলশেগুঁড়ি— সব ধরনের বৃষ্টিতে ভেজা টাপুরের প্যাশন। তার পরেই চুলের নানা সমস্যা। খুশকি, চুল পড়া, গোড়া আলগা হয়ে যাওয়া, সব সময় ভিজে, স্যাঁতসেঁতে ভাব আর কেমন ভ্যাপসা গন্ধ — সব মিলিয়ে টাপুর নাজেহাল। বর্ষাকালে কম-বেশি চুলের এই সমস্যায় ভোগেন ছোট-বড় সবাই।

• গরমে অনেকের মাথায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দেয়। পরে তা ফোঁড়ার আকার নেয়। আর তাতে খুব ব্যথাও হয়। বৃষ্টি শুরুর ১৫-২০ মিনিট পর এই জলে মাথা ভেজালে ফুসকুড়ি, ঘামাচি দুটোই কমবে। বৃষ্টির প্রথম জল লাগানো উচিত নয়। কারণ, ইদানীং যে পরিমাণ দূষণ পরিবেশে থাকছে তার প্রভাব বৃষ্টির জলেও পড়ছে। তাই কিছুক্ষণ বৃষ্টির পর সেই জল ব্যবহার করলে অনেক উপকার মেলে ত্বক আর চুলের ক্ষেত্রে।

• বর্ষায় আবহাওয়া আর্দ্র থাকায় চুলের গোড়া সব সময়েই ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে থাকে। আর তার থেকে চুলে দুর্গন্ধ, চুলের গোড়া আলগা হয়ে যায়। তাই বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ চুল খুলে রাখুন। যাতে চুলের গোড়া শুকিয়ে যায়।

• বর্ষায় চুল পড়ার প্রবণতা একটু বেশিই। অনেকেই তখন তেল বা শ্যাম্পু মাখা বন্ধ করে দেন। চুল কম আঁচড়ান। এটি সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি। অত্যধিক চুল পড়ে গোড়ায় ইনফেকশন হলে অথবা চুলের গোড়া দুর্বল হলে। তাই চুলের প্রকৃতি বুঝে নিয়মিত তেল মাখুন। প্রায়োজন বুঝে শ্যাম্পু করুন।

• রোজের ব্যবহারের তেলে ২০-২৫টা নিমও একমুঠো তুলসীপাতা, এক টুকরো কাঁচা হলুদ বেটে, ছেঁকে রস মিশিয়ে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে চুলের গোড়ার ইনফেকশন কমবে। তুলসী ও নিম চুলের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারি। হলুদ জীবাণুনাশক। দু'মাস বয়সের শিশুকেও এই তেল নিশ্চিন্তে মাখাতে পারেন।

• চুলের গোড়া দুর্বল হলে ৫-১০টি জবাফুল চটকে সারারাত তেলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন এই তেল চুলের গোড়ায় হালকা হাতে মাসাজ করুন। সপ্তাহে তিন-চারদিন মাখলে চুল পড়া কমবে।

• সব সময় কম কেমিক্যালযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে রিঠা, শিকাকাই পাউডার সম পরিমাণে নিয়ে তার সঙ্গে টকদই আর বেসন মেশান। এই পেস্ট ১০ মিনিট চুলে লাগিয়ে ধুয়ে নিন। শ্যাম্পুর কাজ করবে। আবার স্ক্যাল্পও পরিষ্কার হবে।

• ফাংগাল ইনফেকশন কমাতে হলুদ, তুলসী আর নিমপাতা জলে ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। ওই জল রোজ বার দু'য়েক স্ক্যাল্পে মাখুন।

• ঘরে পাতা টকদই, আধ চামচ নুন এবং গোটা টম্যাটোর রস মিশিয়ে স্ক্যাল্পে মাখুন। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে নিন। খুশকি কমবে।

• বর্ষায় লম্বা চুলে রোজ শ্যাম্পু করা অসম্ভব। আবার এই চুল শুকানোতেও অনেক ঝক্কি। এক্ষেত্রে ভাল টোনার দিয়ে রোজ স্ক্যাল্প মুছে নিন। তাহলে সপ্তাহে একবার শ্যাম্পু করলেও চলবে।

• শুধু এই ঋতুতে ভিজে চুল শুকাতে মিডিয়াম টেম্পারেচরে ড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন।

• চুল ভাল রাখতে তেল আর জলের ব্যবহার মাস্ট।

• ঈষদুষ্ণ বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা তেল আগের দিন রাতে কিংবা শ্যাম্পুর দু'ঘণ্টা আগে মাখতে পারেন। চুলে বাড়তি চমক আসবে। ⌘⌘

তথ্য সহায়তায় : জিসা'স স্টেপ ইন স্টাইল
যোগাযোগ : ৯৮৩১১-৮২৬৪০
তথ্যসংগ্রহ : উপালি সাহা

'একজিমা রোগটি মোটেই ছোঁয়াচে নয়। এবং ধৈর্য ধরে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করলে রোগটি সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। এমনকী, একজিমা আক্রান্ত রোগীদের পরবর্তীকালে বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপনেও কোনও বাধা নেই।' কথাগুলি বললেন ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ-এর অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সন্দীপন ধর। একজিমা ব্যাপারটা ঠিক কী, কীভাবে নিরাময় হয় এই রোগের, একজিমা থেকে হতে পারে আর কী কী রোগ , তা জানতেই আমরা আজ ডা. সন্দীপন ধর-এর মুখোমুখি

একজিমা

একজিমা ব্যাপারটা ঠিক কী

একজিমা হল ত্বকের এক ধরনের অ্যালার্জি। এতে চুলকানি হয়, ত্বক ফুলে যায়, গোল গোল চাকা চাকা দেখতে হয়, বেশি বেড়ে গেলে সেখান থেকে রস গড়িয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুখে, হাতে, কনুই, গলা, বুকে, ঘাড়ে, হাতের বা পায়ের খাঁজে একজিমা হয়। বদ্ধ জায়গায় বা খাঁজে একজিমা হওয়ার প্রবণতা সাধারণত বেশি। বাচ্চাদের মূলত হয়, তবে বড়রাও এই রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না। এটি ত্বকের ক্রনিক অ্যালার্জি, যার প্রকোপ শীতে বাড়ে। নাকে বা কানের ফুটোয় একজিমায় বেশি চুলকোলে নখের মাধ্যমে ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে। একজিমা মূলত কয়েক রকমের হয়— কন্ট্যাক্ট ডামাটাইটিস, ডিসহাইড্রোটিক একজিমা, নামমুলার একজিমা।

কোন কোন কারণ একজিমার জন্য মূলত দায়ী

- এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় একজিমা ব্যাপারটা মূলত জেনেটিক্যালি হয়। অর্থাৎ মায়ের একজিমা থাকলে বাচ্চার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে।
- একজিমার প্রধান কারণ জেরোসিস অর্থাৎ ত্বকের শুষ্কতা। ডাক্তারি ভাষায় একটি কথাই আছে, দেয়ার কান্ট বি অ্যান অ্যাটোপিক ডামাটাইটিস (অর্থাৎ একজিমা) উইদাউট ড্রাইনেস।
- এছাড়া রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর। আর এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটা উঠে আসে তা হল পরিবেশ দূষণ। চারিদিকে দূষণ এত বেড়ে গেছে, সেখান থেকে একজিমা বা অ্যাটোপিক ডামাটাইটিসের মতো ত্বকের রোগ হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।
- ফুলের রেণু, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাস্ট, বিশেষ কিছু খাবার, যেমন ডিম, গোরুর দুধ, দুগ্ধজাত প্রোডাক্ট, আঁশবিহীন মাছ, যেমন ইলিশ এবং চিংড়ি মাছে কারওর অ্যালার্জি থাকলে সেখান থেকে একজিমার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইদানীং খুব বেশি দেখা যাচ্ছে পিনাট অ্যালার্জি। বাদামে অ্যালার্জি থাকলে পিনাট দেওয়া পেস্ট্রি, আইসক্রিম বা পিনাট বাটার এড়িয়ে চলাই ভাল।
- অনেকের বিশেষ কোনও কেমিক্যালের সংস্পর্শ থেকে রোগ হয়।
- উলের মতো কোনও রাফ মেটিরিয়ালের সংস্পর্শে থাকলে বা বেশিবার স্নানও রোগটিকে ত্বরান্বিত করে।
- বর্ষাকালে পায়ে জল, ময়লা, কাদা লাগলে এবং দীর্ঘদিন তা ঠিকমতো পরিষ্কার না করে ফেলে রাখলে একজিমার সমস্যা হয়।
- বড়দের মধ্যে যাদের অ্যাটোপিক অ্যালার্জির (অর্থাৎ শরীরে কোনও ফরেন বডি ঢুকলে খুব তাড়াতাড়ি তা রি-অ্যাক্ট করতে থাকে) সমস্যা আছে, তাদের একজিমায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।
- কয়েকটি বিশেষ গ্রুপের ওষুধ যেমন পেনিসিলিন, সালফার, টেট্রাসাইক্লিন, নরফ্লক্সাসিন থেকেও এই রোগ হতে পারে। তবে এটি রেয়ার কেসের মধ্যে পড়ে।
- এছাড়াও আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘাম বেশি হলে ঠিকমতো ইভাপোরেশন হয় না, সেখান থেকেও একজিমার সমস্যা হয়।
- এছাড়া রয়েছে স্ট্রেস ও টেনশন। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। যদিও টেনশনের সঙ্গে একজিমার সরাসরি সম্পর্ক নেই। তবে একজিমায় আক্রান্ত রোগীদের অতিরিক্ত টেনশনে সমস্যা বাড়ে।

কী কী দেখে বুঝবেন একজিমা হয়েছে

- লাল র‍্যাশের সঙ্গে চুলকানি
- দানার সঙ্গে পুঁজ পড়ছে
- ত্বকের রঙ পালটে যাওয়া
- ক্রমাগত চুলকোতে চুলকোতে কিছু জায়গা মোটা হয়ে যাওয়া। একে বলে লিচেনিফিকেশন
- অনেকসময় র‍্যাশ বেরনোর আগেই চুলকানি শুরু হয়ে যায়।

রোগনির্ণয় করা হয় কীভাবে

রোগনির্ণয়ের প্রথম ধাপ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। অর্থাৎ চোখে লক্ষণগুলি দেখে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে বুঝতে হবে। এছাড়া রয়েছে রক্তের ইমিউনো গ্লোবিউলিন টেস্ট। এছাড়াও করা হয় টোটাল ব্লাড কাউন্ট। সেখানে যদি দেখা যায় ইওসিনোফিল বেড়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে কোনওরকম অ্যালার্জি রয়েছে। এছাড়াও ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেওয়া, স্কিন বায়োপ্সি, অ্যালার্জি স্কিন টেস্টিংও করা হয়।

> “ ফুড অ্যালার্জি বলতে যা বোঝায়, সেখানে খাবার থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে মাত্র ৫ শতাংশ আর যেসব প্রিজারভেটিভ দিয়ে খাবার রাখা হচ্ছে, সেই প্রিজারভেটিভ অ্যালার্জি ৩৫ শতাংশ। অনেকেরই বাইরের প্রিজারভেটিভে রাখা চিকেন খেলে অসুবিধে হয়, অথচ বাড়িতে বাজার থেকে কিনে এনে রান্না করলে সে দিব্যি খাচ্ছে, এরকম ঘটনা বিরল হলেও দেখা গেছে। ”

একজিমা ও ইনফেকশন

একজিমা খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেলে ইনফেকশন পর্যন্ত হতে পারে। একজিমার ইনফেকশনের জন্য স্ট্যাফেলোকক্কাস ওরিয়াস নামে এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়াই দায়ী মূলত। এছাড়াও একজিমাতে ফাংগাস বা ভাইরাল ইনফেকশনও হতে পারে। ইনফেকশন বেশি হলে পুঁজ গড়িয়ে পড়ে, রক্ত পড়ে, আর বেশি চুলকে ফেললে তো কেটে গিয়ে রক্ত পড়া অবশ্যম্ভাবী। একজিমার বাড়াবাড়িতে চাকাচাকা হয়ে যায় আর তার চারপাশে দানা দানা ফুসকুড়ির মতো র‍্যাশ দেখা যায়। তবে রক্ত পড়া মানে বুঝতে হবে ব্যাপারটা সিরিয়াস পর্যায়ে চলে গেছে।

বাচ্চাদের সমস্যা

বাচ্চাদের মূলত রোগটি হয় জেনেটিক্যালি। এছাড়াও দায়ী পরিবেশ দূষণ। বাইরে খেলতে গেলে সেখানে ধুলো, গাছপালা, নানারকম পোকামাকড়ের সংস্পর্শে রোগের প্রকোপ বাড়ে। অনেকসময় এগুলো সেনসিটাইজড হয়ে যায়। টেডি নিয়ে খেললে, গালে বেশি ঘষাঘষি করলেও, বাচ্চাদের একজিমার জন্য দায়ী। স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের তো আর বাড়িতে আটকে রাখা যাবে না, তবে যথাসম্ভব সতর্কতা মেনে চলা উচিত।

একজিমা ও ফুড অ্যালার্জি

ইদানীং আমরা ফুড অ্যালার্জি কথাটি ভীষণ বেশি ব্যবহার করি। কোনও খাবার খেয়ে গা চুলকোলেই ধরে নিই সেটা থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে। সম্প্রতি লন্ডনে প্রকাশিত একটি জার্নালে দেখা গেছে ফুড অ্যালার্জি বলতে যা বোঝায়, সেখানে খাবার থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে মাত্র ৫ শতাংশ আর যেসব প্রিজারভেটিভ দিয়ে খাবার রাখা হচ্ছে, সেই প্রিজারভেটিভ অ্যালার্জি ৩৫ শতাংশ। অনেকেরই বাইরের প্রিজারভেটিভে রাখা চিকেন খেলে অসুবিধে হয়, অথচ বাড়িতে বাজার থেকে কিনে এনে রান্না করলে সে দিব্যি খাচ্ছে, এরকম ঘটনা বিরল হলেও দেখা গেছে। সুতরাং বাচ্চাদের ফুড অ্যালার্জি হলে তাদের ডায়েট কন্ট্রোল করানো খুব সমস্যা। তাদের চারপাশে সবাই খাচ্ছে, আর তারা খাবে না, এটা হতে পারে না। সুতরাং কোথায় কী অ্যালার্জি, খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আগে তা জানা উচিত।

একজিমার চিকিৎসা কীভাবে হয়

একজিমা রোগটি প্রাণঘাতী নয়। এর থেকে খারাপ কিছু হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করা হয় অ্যান্টি অ্যালার্জিক দিয়ে। সেট্রিজিন, ফ্লেক্সোফেনাডিন, লিভোসেট্রিজিন, লোরাটিডিন গ্রুপের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়। তবে ওষুধের গ্রুপের নাম জেনে নিজেরা ওষুধ খাওয়া কিন্তু যেমন অনুচিত তেমনই স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। মারাত্মক ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় অ্যামোক্সিসিলিন, ফ্লোক্সাসিন, মেথোট্রেক্সেট গ্রুপের। লাগানোর জন্য দেওয়া হয় স্টেরয়েড মলম। শরীরে ময়েশ্চারাইজার লাগান। তবে কোনও সুগন্ধীযুক্ত ময়েশ্চারাইজার নয়।

২ বছরের বেশি বয়স্কদের টপিকাল ইমিউনোমড্যুলেটারস (টিএম) যেমন ট্যাক্রোলিমাস দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

একজিমা সঠিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সেরে যায় আস্তে আস্তে। অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রেই দু'বছর পর পর খানিকটা করে রোগটি কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কারওর হয়তো দু'বছর বয়সে একজিমা হল, তার ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫ বছর বয়সে রোগটি অনেকটা কমতে দেখা গেল, আবার কিছুদিন পর প্রকোপ দেখা গেল। যে বয়সে রোগটি কিছুটা কমছে, তাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে অ্যাটোপিক স্টেশন। বয়স বাড়লে আস্তে আস্তে রোগটি নির্মূল হয়ে যায়।

তবে যত বড় বয়সে একজিমার অ্যাটাক হয় সেটা সারতে খুব দেরি হয়। ৪০-এ হলে সারতে সারতে ৬০, আর ৬০-এ হলে সারতে সারাজীবন লেগে যায়। বাচ্চাদের শরীরের মেকানিজম বড়দের থেকে আলাদা। ওদের অনেক তাড়াতাড়ি সেরে যায় একজিমা।

একজিমা ও অ্যালার্জি

ছোটবেলা থেকেই আমরা একটা কথা শুনে আসি যে, একজিমা কমলে হাঁপানি হবে। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, অ্যাটোপিক রাইনাটিস (ঘুম থেকে উঠে ২০-২৫ টা হাঁচি, সঙ্গে নাক দিয়ে জল পড়া) এবং অ্যাটোপিক ব্রঙ্কাইটিস (শ্বাসকষ্ট) সবই কিন্তু বাইরের কোনও উপাদানের (যেমন ডাস্ট) সঙ্গে শরীরের সংস্পর্শ হলেই হয়। একজিমা থাকলে তার পরবর্তীকালে শ্বাসকষ্ট হতেই পারে। এটিই অ্যাটোপিক অ্যালার্জি। অর্থাৎ কি না আগেই বলা হয়েছে, ফরেন বডির প্রভাবে শরীরের বিক্রিয়া। মানে তার শরীরটাই ফরেন বডিতে বেশি করে রেসপন্স করছে, এর সঙ্গে একজিমা কমার কোনও সম্পর্ক নেই।

একজিমায় কখন সমস্যা বেশি হয়

- যদি একজিমা খুব অল্প বয়সে শুরু হয়
- শরীরের অনেকটা অংশে রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে
- অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা অ্যাজমা আছে
- পারিবারিক ইতিহাস থাকলে। ⌘⌘

কোন কোন সতর্কতা মেনে চললে একজিমার প্রকোপ এড়ানো সম্ভব

- সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা মেনে চলতে হবে।
- নখ যতটা সম্ভব কেটে রাখা ভাল।
- একজিমায় সাধারণ সাবান ব্যবহার করুন, বিশেষ করে ময়েশ্চারাইজারযুক্ত সাবান। মেডিকেটেড সোপ এড়িয়ে চলুন।
- অযথা টেনশন ও স্ট্রেসকে জীবন থেকে দূর করুন।
- অতিরিক্ত ঘাম থেকে বাঁচতে বারেবারে স্নান করুন।
- যত বেশি সম্ভব এসি-তে থাকুন।
- ডিওডোরেন্ট, বডি স্প্রে, পারফিউম লাগান নিয়মিত ব্যবধানে।
- পাউডার কম লাগান। কারণ পাউডারে ত্বকের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে সমস্যা বাড়ে।
- স্নানের সময় কোনও অংশ বেশি জোরে বেশিক্ষণ ধরে ঘষবেন না।

যোগাযোগ- ৯৮৭৪৯৬৮১৩৯
সাক্ষাৎকার- দোয়েল দত্ত

রেলসূচি

পূর্ব রেলের সফরসূচি (হাওড়া থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২২৭৩	দুরন্ত এক্সপ্রেস (অমৃতসর)	১৩.০০	(সোম, শুক্র)
১২৩১১	দিল্লি-কালকা মেল	১৯.৪০	
১৩০০৫	অমৃতসর মেল	১৯.১০	
১২৩২১	মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	২২.০০	
১২৩৮১	পূর্বা এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি)	৮.২০	(ভায়া গয়া, বেনারস)
১২৩০৩	পূর্বা এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি) (ভায়া পাটনা)	৮.১০	
১২৩২৩	হাওড়া-নিউদিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৮.৪৫	
১২২৪৯	যুব এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি)	১৭.১০	(বৃহ)
১২৩০১	রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১৬.৫৫	(রবি ছাড়া)
১২৩০৫	রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১৪.০৫	(রবি)
১২৩০৭	যোধপুর এক্সপ্রেস	২৩.৩০	
১২০১৯	শতাব্দী এক্সপ্রেস (বোকারো, রাঁচী)	৬.০৫	(রবি ছাড়া)
১৩৪৮৫	মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৫.১৫	(রবি ছাড়া)
১২৩৩১	হিমগিরি এক্সপ্রেস (জম্মু-তাওয়াই)	২৩.৫৫	(মঙ্গল, শুক্র, শনি)
১২৩৬৯	কুম্ভ এক্সপ্রেস (হরিদ্বার)	১৩.১০	(সোম, বুধ, বৃহ, শনি, রবি)
১২৩৪৫	সরাইঘাট এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি)	১৫.৫০	
১২৩২৭	উপাসনা এক্সপ্রেস (দেরাদুন)	১৩.১০	(মঙ্গল, শুক্র)
১৩০৩৯	দিল্লি-জনতা এক্সপ্রেস	২০.২০	
১৩০৪৯	অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৪.০০	
১৮০১৯	বাঘ এক্সপ্রেস (কাঠগুদাম)	২৩.৪৫	
১৩৮২১	মিথিলা এক্সপ্রেস (রক্সৌল)	১৫.৪৫	
১২৩৮৫	ডবলডেকার এক্সপ্রেস (ধানবাদ)	৮.৩০	
১২৩৪১	অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস (আসানসোল)	১৮.২০	
১২৩৫১	দানাপুর এক্সপ্রেস	২০.৩৫	
১২৩৩৭	শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১০.১০	
১৩০১৫	কবিগুরু এক্সপ্রেস (বোলপুর)	১০.৪৫	
১৮০১৭	গণদেবতা এক্সপ্রেস	৬.০৫	
১২৩৩৩	বিভূতি এক্সপ্রেস (বেনারস)	২০.০০	
১৩০২৭	কবিগুরু এক্সপ্রেস (আজিমগঞ্জ)	২২.৪০	
১২১৭৫	চম্বল এক্সপ্রেস (গোয়ালিয়র)	১৭.৪৫	(মঙ্গল, বুধ, রবি)
১৯৩০৬	শিপ্রা এক্সপ্রেস (ইন্দোর)	১৭.৪৫	(সোম, বৃহ, শনি)
১১৪৪৮	শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (জব্বলপুর)	১৪.৩০	
১২১৭৭	চম্বল এক্সপ্রেস (আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট)	১৭.৪৫	(শুক্র)
১৩০৫৩	হাওড়া-সিউড়ি এক্সপ্রেস	২০.৩৫	

পূর্ব রেলের সফরসূচি (শিয়ালদহ থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২৩১৩	রাজধানী এক্সপ্রেস	১৬.৫০	
১০২৫৯	নিউদিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১৮.৪০	(সোম, বুধ, বৃহ, রবি)
১২৩৭৭	পদাতিক এক্সপ্রেস (নিউ জলপাইগুড়ি)	২২.৫৫	
১৩১৪১	তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩.৪০	
১২৩৪৩	দার্জিলিং মেল	২২.০৫	
১৫৬৫৭	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	৬.৩৫	
১২৩৭৯	জালিনওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস (অমৃতসর)	১৩.১০	(শুক্রবার)
১৩১৪৭	উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (নিউ কোচবিহার)	১৯.৩৫	
১৩১৪৯	কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (আলিপুরদুয়ার)	২০.৩০	
১৩১৬৩	হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (সহর্ষ)	২০.১০	
১৩১৩৩	শিয়ালদহ- বেনারস এক্সপ্রেস (এসবিজি লুপ)	২১.১৫	
১২৩১৭	অকালতখ্ত এক্সপ্রেস	৭.৪০	(বুধ, রবি)
১৩১৫৩	গৌড় এক্সপ্রেস	২২.১৫	

পূর্ব রেলের সফরসূচি (কলকাতা (চিৎপুর) থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১৩১১১	লালকেল্লা এক্সপ্রেস (ভায়া মেন লাইন)	২০.১৫	
১৫০৪৯	গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস	১৪.৩০	(বুধ, রবি)
১৫০৫১	গোরক্ষপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (ভায়া নারকাটিয়াগঞ্জ)	১৪.৩০	(শুক্র)
১৫০৪৭	পূর্বাঞ্চল (গোরক্ষপুর) এক্সপ্রেস	১৪.৩০	(সোম, মঙ্গল, বৃহ, শনি)
১৩১৫১	জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস	১১.৪৫	
১৩১৫৫	মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস (দ্বারভাঙা)	২০.৫৫	(বৃহ, রবি)
১২৩৫৯	গরিব রথ এক্সপ্রেস (পাটনা)	২০.০০	(মঙ্গল, বৃহ)
১২৩৬৩	হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৯.০৫	(মঙ্গল, বৃহ, শনি)
১৩১১৩	হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস (মুর্শিদাবাদ লালগোলা)	৬.৫০	
১৯৬০৫	সারে জাঁহা সে আচ্ছা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (আজমীর)	১৩.১০	(শনি)
১২৩১৯	আগ্রা এক্সপ্রেস	১৩.১০	(বুধ)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সফরসূচি (হাওড়া থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২৮৩৯	চেন্নাই মেল	২৩.৪৫	
১২৮১০	মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	২০.১৫	
১২৮৬০	গীতাঞ্জলি মুম্বই এক্সপ্রেস	১৩.৫০	
১২৮৩৪	আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস	২৩.৫৫	
১২৮৪১	করমণ্ডল (চেন্নাই এক্সপ্রেস)	১৪.৫০	
১২৭০৩	ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	৭.২৫	
১২৮১৩	টাটা স্টীল এক্সপ্রেস	১৭.৩০	
১২৮৭১	ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	৬.৫৫	
১২৮৩৭	পুরী এক্সপ্রেস	২২.৩৫	
১৮৪০৯	শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৯.০০	
১২৮২১	ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	৬.০০	
১২৮৪৭	হাওড়া-দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১১.১৫	
১৮০০১	হাওড়া-দীঘা কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৪.১৫	
১৮৬৪৫	ইস্ট কোস্ট (হায়দরাবাদ) এক্সপ্রেস	১১.৪৫	
১২৮২৭	পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১৬.৫০	
১২১৩০	আজাদ হিন্দ (পুনে) এক্সপ্রেস	২১.৫৫	
১২৮৮৩	রূপসী বাংলা (পুরুলিয়া এক্সপ্রেস)	৬.০০	
১২২৭৭	হাওড়া-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	১৪.২৫	বুধবার ছাড়া
১২২৬২	হাওড়া-মুম্বই (ভি টি) দুরন্ত এক্সপ্রেস	৮.২০	সোম, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র
১২৮৭০	হাওড়া-মুম্বই উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৪.৩৫	শুক্রবার
১২২৪৫	হাওড়া-যশবন্তপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১১.০০	মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি ও রবি
১২০৭৩	ভুবনেশ্বর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস	১৩.৩৫	রবিবার ছাড়া
১২১০২	জ্ঞানেশ্বরী (কুরলা, মুম্বই) এক্সপ্রেস	২২.৫৫	সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও রবি
১৮৬১৭	হাওড়া-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ভায়া টাটানগর	১৫.০৫	বৃহস্পতি, শুক্র, শনি
১৫৯০২	ডিব্রুগড়-হাওড়া-যশবন্তপুর উইকলি এক্সপ্রেস	১.০৫	রবিবার
১৫৬১২	কামাক্ষা-হাওড়া-কুরলা কর্মভূমি উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.৩৫	রবিবার
১২৮৯৫	হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস	২০.৫৫	শুক্রবার
১৮০৪৭	হাওড়া- ভাস্কো অমরাবতী এক্সপ্রেস	২৩.৩০	সোম, মঙ্গল, কৃস্পতি ও শনি
১২৮৬৫	হাওড়া-পুরুলিয়া লালমাটি এক্সপ্রেস	৮.৩০	মঙ্গল ও শনি
১২৫১৫	ত্রিবান্দ্রম সেন্ট্রাল-হাওড়া-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	১১.১৫	মঙ্গলবার
১২৬৬৩	তিরুচিরাপল্লী বাই-উইকলি এক্সপ্রেস	১৬.১০	বৃহস্পতিবার
১২৬৬৫	কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস	১৬.১০	সোমবার
১২৯০৬	হাওড়া-পোরবন্দর/ওখা এক্সপ্রেস	২২.৫৫	শুক্র, শনি
১২৫১৩	সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া-গুয়াহাটি উইকলি এক্সপ্রেস	১১.১৫	সোমবার
১৫২২৮	মুজফ্ফরপুর-হাওড়া-যশবন্তপুর উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.১৫	সোমবার
১৫২২৭	যশবন্তপুর-হাওড়া-মুজফ্ফরপুর উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.১৫	শুক্রবার
১২১৫২	হাওড়া-কুরলা সমরাষ্ট্র এক্সপ্রেস ভায়া আদরা	২১.১৫	শুক্রবার
১৫৭২২	নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া-দীঘা ফারিয়া এক্সপ্রেস	৭.৫০	শনিবার
১২৮৬৭	হাওড়া-পণ্ডিচেরী উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.৩০	রবিবার
১২৫৭১	হাওড়া-শ্রী সত্য সাঁই প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস	১৫.৫০	বুধবার
২২৮১৭	মাইসোর উইকলি এক্সপ্রেস	১৬.১০	শুক্রবার
১৫৬৪৪	কামাক্ষ্যা-হাওড়া-পুরী উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.৩০	শুক্রবার

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সফরসূচি (শালিমার থেকে)

১৮০৩০	কুরলা এক্সপ্রেস	১৫.০০	
১৬৩২৪	শালিমার-ত্রিবান্দ্রম বাই-উইকলি এক্সপ্রেস	২২.৪৫	মঙ্গল ও রবিবার
১৫০২১	শালিমার-গোরক্ষপুর উইকলি এক্সপ্রেস	২০.২৫	মঙ্গলবার
১৮০০৭	শালিমার-বারিপদা ইন্টারসিটি ট্রাই-উইকলি এক্সপ্রেস	৬.৪০	রবি, বুধ ও বৃহস্পতি
২২৮৩৫	শালিমার-পুরী উইকলি এক্সপ্রেস	২১.০০	বুধবার
২২৮৫৩	শালিমার-বিশাখাপত্তনম উইকলি এক্সপ্রেস	১৮.১৫	মঙ্গলবার
২২২১৩	শালিমার-পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২.০৫	সোম, বুধ ও শুক্র
২২৮৫৯	শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ উইকলি এক্সপ্রেস	১২.২০	শুক্রবার

দক্ষিণ পূর্ব রেলের সফরসূচি (শালিমার থেকে)

২২৮৫৫	সাঁতরাগাছি-তিরুপতি উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৬.০৫	
১২৭৬৮	সাঁতরাগাছি-হাজুর সাহিব নানদেড় উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.৫০	বুধবার

রেল সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ২৬৩৮ ২২১৭/২৬৩৭ ৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৮৪, পূর্ব রেলওয়ে ১৩১০, শিয়ালদহ অনুসন্ধান ২৩৫০ ৩৫৩৫/৩৫৩৭, হাওড়া অনুসন্ধান ২৬৩৮ ২৫৮১ শালিমার ২৬৬৮ ১১২১, হাওড়া গুডস কমপ্লেক্স ১৩৩১/১৩৩২, হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স ২৬৩৮ ২২১৭, রিজার্ভেশন এনকোয়্যারি ১৩৯

উড়ানসূচি

এ.আই - এয়ার ইন্ডিয়া, বি.এ - ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, বি.জি - বিমান বাংলাদেশ, সি.ডি - অ্যালায়েন্স এয়ার, এফ.এস - কসমিক এয়ার, এফ.ডি - থাই এয়ার এশিয়া, জি.এফ - গাল্‌ফ এয়ার, আই.এক্স - এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, কে.বি - ড্রুক এয়ার, ই.কে - এমিরেটস, এস.জি - স্পাইস জেট, এস.কিউ - সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স, এস.টু - জেটলাইট, টি.জি - থাই এয়ারওয়েজ, ৯ ডব্লিউ - জেট এয়ারওয়েজ, জেড ফাইভ - জি.এম.জি এয়ারলাইন্স, সিক্স.ই - ইন্ডিগো, এ. কে - এয়ার এশিয়া, ফোর এইচ - ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ।

অভ্যন্তরীণ উড়ান

ফ্লাইট নং	কলকাতা থেকে ছাড়ার সময়	দিন
আগরতলা		
এস টু ৩৭১	৭.৫০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৭৩	৮.৫০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৩	১১.৩০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৪২	১২.১০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭১	১৪.১৫	প্রতিদিন
এ আই ৯৭২৭	১৬.৫০	বুধ, শুক্র, রবি
আহমেদাবাদ		
সিক্স ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন (সোম-শনি)
সিক্স ই ২৩৮	৮.১৫	রবিবার
সিক্স ই ১৩৬	১১.১৫	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
আইজল		
৯ ডব্লিউ ২৮৭১	১০.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭১১	১১.০০	বুধ, শুক্র, রবি
বাগডোগরা		
৯ ডব্লিউ ২৪৮০	১২.২০	প্রতিদিন
এ আই ০৭২১	১৩.০৫	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
এ আই ০৭২১	১৩.৪০	বুধবার
এস জি ৩২৩	১৩.৫৫	প্রতিদিন
বেঙ্গালুরু		
সিক্স ই ৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৫২৩	৭.২০	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গল ছাড়া প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪২	২০.১০	প্রতিদিন
ভোপাল		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
ভুবনেশ্বর		
৯ ডব্লিউ ২১৫০	১১.২৫	প্রতিদিন
চেন্নাই		
সিক্স ই ২৭৫	৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ৮৪২	১৫.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৩২৪	১৭.০৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৯১	২০.৩০	প্রতিদিন
দিল্লি		
এ আই ০১১১	১০.১০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৩৬	১১.৪৫	প্রতিদিন
এস জি ৬০৬	১২.০০	প্রতিদিন
এ আই ০৭৬১	১৩.২৫	প্রতিদিন
এস টু ৩২০	১৫.৩০	প্রতিদিন
এ আই ০৭০১	১৭.০০	প্রতিদিন
ডিব্রুগড়		
সিক্স ই ২০৫	১২.৩০	প্রতিদিন
গয়া		
এ আই ০২২৭	১০.০০	সোমবার
গোয়া		
এস জি ৮০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
গুয়াহাটি		
এস টু ৩৬১	৬.১০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৯২	১৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৪৮২	১৬.৫০	রবিবার ছাড়া রোজ
এস জি ৮৮৩	১৭.৪৫	প্রতিদিন
হায়দরাবাদ		
সিক্স ই ৩৪৮	৭.২৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৫২	১৬.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭২	১৭.৫০	প্রতিদিন
ইন্দোর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
জয়পুর		
সিক্স ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন
এস জি ৩৪৫	১৬.৪৫	প্রতিদিন
জোরহাট		
এস টু ৬২৩	১২.২৫	সোম, বুধ, শুক্র
কানপুর		
এ আই ৯৮০২	১৪.০০	সোম, বুধ, শুক্র
কোচি		
এস জি ৮০৩/১০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন
লখনউ		
সিক্স ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
মুম্বই		
সিক্স ই ৩১৮	৫.৫৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২০৩	১৪.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০৪	১৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৪	১৮.০০	প্রতিদিন
সিক্স ই ৪০৪ (ভায়া নাগপুর)	১৮.২০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২১২	২১.০৫	প্রতিদিন
নাগপুর		
সিক্স ই ৪০৪	১৮.২০	প্রতিদিন
পাটনা		
৯ ডব্লিউ ২৮৫২	৬.১৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৮৫৪	১৭.৫০	প্রতিদিন
পোর্ট ব্লেয়ার		
এ আই ০৭৮৭	৫.৩৫	প্রতিদিন
পুণে		
৯ ডব্লিউ ২০২	৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ২১৯	১৭.৪০	প্রতিদিন
রায়পুর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
রাঁচি		
৯ ডব্লিউ ২৮৫৬	১৫.০৫	প্রতিদিন
শিলচর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
৯ ডব্লিউ ২৮৭৫	৫.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭৫৩	১৩.০৫	সোম, বুধ
শিলং		
এ আই ৯৭১৯	১১.৪০	সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি
এ আই ৯৭১১	১৩.১০	বুধ, রবিবার
শ্রীনগর		
এস জি ৬০৪/২২৪	৭.১৫	প্রতিদিন
তেজপুর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
ত্রিবান্দ্রম		
সিক্স ই ৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
বরোদা		
সিক্স ই ২১২	৭.০৫	প্রতিদিন
বারাণসী		
৯ ডব্লিউ ২৪৬১	১১.০৫	প্রতিদিন
বিশাখাপত্তনম		
৯ ডব্লিউ ২৮৪১	৬.০৫	প্রতিদিন

বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য

এয়ার ইন্ডিয়া : ২২৮২ ২৩৫৬, এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ৯৪৩৩, জেট এয়ারওয়েজ : ৩৯৮৯ ৩৩৩৩, স্পাইস জেট : ১৮০০ ১৮০ ৩৩৩৩, ইন্ডিগো ৪০০৩ ৬২০৪ এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ৮৪৪২/৮৩৫৭, জেট লাইট : ১৮০০ ২২৩০২০, এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ০৯০১

(রেল ও বিমানের ছাড়ার সময় পরিবর্তনসাপেক্ষ। যাত্রার আগে অবশ্যই অনুসন্ধান করে নেবেন।)

বাসযাত্রা

রয়্যাল ক্রুজার

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৭টা
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-পুরী
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা
পুরী থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬টা ৪৫, সাড়ে সাতটা, সাড়ে নটা, বিকেল ৪টে ও বিকেল ৫টা
ধর্মতলা থেকে বিকেল ৪টেয় যে বাসটি ছাড়ে সেটি বোকারোও যায়।

এসবিএসটিসি

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা, ৬টা, ১০-১০, ১২-৪৫

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪০, ৬-৪০, ৭-৩০

কলকাতা-রায়গঞ্জ
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-১০, ৮-১০

কলকাতা-গঙ্গারামপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৩০, ৬-৫০, ৭-৫০

কলকাতা-নালাগোলা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬-১৫

কলকাতা-দুর্গাপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা থেকে সন্ধে ৬-৩০ (১৫ মিনিট অন্তর গাড়ি)

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে সকাল ৫-১৫ থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ৩-৩০, ৩-৪৫

কলকাতা-পুরুলিয়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ২-১৫

এনবিএসটিসি

কলকাতা-আলিপুরদুয়ার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-বহরমপুর
সকাল ৬-৪৫, দুপুর ১২টা। বহরমপুর থেকে ছাড়ে একই সময়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ১০টা, দুপুর ২-৪০। ওখান থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-৩০

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট রাত ৮টা

কলকাতা-চাঁচোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট ৯-৩০

কলকাতা-কোচবিহার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে দুপুর ২টো, রাত ৮টা, রকেট রাত ৮টা
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০, রকেট ৮টা

কলকাতা-দার্জিলিং
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-দীঘা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রকেট, রাত ৯-৩০

কলকাতা-জলপাইগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৮টা
জয় দাদা ভলভো

কলকাতা-তারাপীঠ
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সকাল ৭-১৫
তারাপীঠ থেকে ছাড়ে বিকেল ৪টে

কলকাতা-শিলিগুড়ি
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭-৩০

কলকাতা-আসানসোল
সল্টলেক থেকে সকাল ৯টা, বাবুঘাট থেকে ১০টা

কলকাতা-বোকারো
সল্টলেক থেকে সকাল ৬-৩০, বিকেল ৪টে বাবুঘাট থেকে সকাল ৭-৩০, বিকেল ৫টা

দক্ষিণী আহার

ভূরিভোজ

ছুটির বিকেলে ভ্রু-তে ভাঁজ। পরিবারের সবাই তো আছেনই। আবার অতিথিও আসতে পারেন বাড়িতে। রোল, চাউমিন তো যখন তখন চলতেই পারে। জলখাবারে স্পেশাল কিছু হবে না! তা হলে হয়ে যাক কিছু দক্ষিণী ডিশ । রেসিপি দিলেন

সুদীপা গুহ

দোসা

উপকরণ : ৩ কাপ আতপ চাল, ১ কাপ কালো ভাঙা মুসুর ডাল, ১ টেবল চামচ নুন, ১ টেবল চামচ মেথি, প্রয়োজন মতো সাদা তেল।

প্রণালী : চাল, ডাল, মেথি অন্তত ৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। নরম হয়ে গেলে গ্রাইন্ডারে অল্প জল দিয়ে একটি পাতলা ব্যাটার তৈরি করুন। আবার ব্যাটারটি বারো ঘণ্টা চাপা দিয়ে রেখে দিন। এরপর একটি চ্যাটালো ননস্টিক প্যানে অল্প তেল মাখিয়ে ১ টেবল চামচ মতো গোলা পুরো পাত্রে গোল করে ছড়িয়ে দিন। মুচমুচে হলে ভাঁজ করে নামিয়ে নিন। প্রতিটি দোসা করার আগে ভিজে কাপড় দিয়ে তাওয়া মুছে নেবেন।

সম্বর

উপকরণ : ১ কাপ অড়হর ডাল, ১/২ কাপ ছোলার ডাল, বেগুন, সজনে ডাঁটা, আলু, টম্যাটো, কুমড়ো, গাজর সব সবজি ১ ইঞ্চি করে কাটা, ২ টো পেঁয়াজ চার ফালি করে কাটা, নারকেল কোরা ৩ চামচ। ২ টেবল চামচ তেল, সরষে, কারিপাতা। ছোট তেঁতুলের বল, রেডিমেড সম্বর মশলা ২ টেবল চামচ, নুন আন্দাজমতো।

প্রণালী : প্রেশার কুকারে সবজি ও সব ডাল সেদ্ধ করে নিতে হবে পেঁয়াজ সমেত। খেয়াল রাখতে হবে যাতে গলে না যায়। এবার কড়াইতে তেল গরম করে সরষে, কারিপাতা, পেঁয়াজ ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ ডাল দিয়ে দিতে হবে। কম আঁচে নুন, সম্বর মশলা সহ ১০ মিনিট ফুটতে দিতে হবে। এরপর নারকেল কোরা গুঁড়ো দিয়ে আরও ৫ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। পরিবেশন করবেন গরম ভাতের সঙ্গে।

আলু বন্ডা

উপকরণ : ৪-৫টা সেদ্ধ আলু (মাঝারি), ২টো টম্যাটো, ১টা পেঁয়াজ, ৩-৪ চামচ সাদা তেল, ১/২ চা-চামচ সরষে, কারিপাতা, ১/২ চামচ হলুদ ও লংকাগুঁড়ো, ধনেপাতা ২ টেবল চামচ।

ব্যাটারের উপকরণ : ২ কাপ বেসন, ১.৫ কাপ জল, নুন আন্দাজমতো, ১ টা পাতিলেবুর রস, ভাজার জন্য ৪ টেবল চামচ তেল।

প্রণালী : কড়াইতে তেল গরম করে সরষে, কারিপাতা, পেঁয়াজ লালচে হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। তাতে টম্যাটো, হলুদ, নুন, কাঁচা লংকা দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। সেদ্ধ আলু মেখে মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। এবার গোল করে নিতে হবে। ব্যাটারে ডুবিয়ে তাকে লাল করে ভেজে নিতে হবে। পরিবেশন করতে পারেন চাটনি বা সম্বরের সঙ্গে।

নারকেল চাটনি

উপকরণ : নারকেল কোরা ১ কাপ, রসুন ৩ কোয়া, নুন আন্দাজমতো, ১ চা-চামচ তেঁতুলের পেস্ট, ফোড়নের জন্য সরষে, কারিপাতা।

প্রণালী : উপকরণের সবকিছুকে একসঙ্গে মিক্সিতে পেস্ট করে নিতে হবে। এবার কড়াইতে তেল গরম করে সরষে, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে পেস্টটি দিয়ে দিতে হবে। (পরিবেশন করতে পারেন সম্বর, ইডলি দোসার সঙ্গে)।

দই বড়া

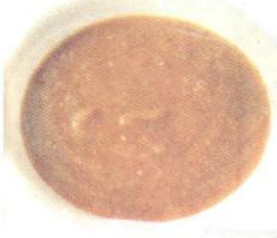

উপকরণ : কলাই ডাল ২ কাপ (আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখতে হবে), নুন আন্দাজমতো, সরষে, কারিপাতা, তেল (ডিপ ফ্রাই করার জন্য), টক দই (জল ছাড়া থকথকে) ২ কাপ, ভাজা মশলার গুঁড়ো (গোটা জিরে আর শুকনো লংকা)।

প্রণালী : ডাল অল্প জল দিয়ে বেটে নিয়ে পাতলা কাপড় দিয়ে ৬-৭ ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে কোনও গরম জায়গায়। ফারমেন্ট হওয়া পর্যন্ত। এবার কড়াইতে তেল দিতে হবে বড়া ভাজার জন্য। পাশাপাশি একটি সসপ্যানে গরম জল ফুটতে দিতে হবে নুন দিয়ে। মিশ্রণটিকে ভালভাবে ফেটিয়ে নিয়ে ১ হাতা করে দিয়ে তেলে ভাজতে হবে। ভাজা বড়াগুলিকে তেল থেকে উঠিয়েই গরম জলে ২-৩ মিনিটের জন্য দিয়ে দিতে হবে। এবার জল থেকে তুলে সার্ভিং ট্রে-তে দিয়ে তার ওপর ফেটানো দই, জিরে গুঁড়ো ও তেঁতুলের চাটনি ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।

আভিয়াল

উপকরণ : ১ টা বেগুন, ২টো গাজর, ১০-১৫টা বিনস, ১ টা ছোট আলু, ১ টা ক্যাপসিকাম, ৪ চামচ নারকেল কোরানো, ফোড়নের জন্য সরষে, কারিপাতা, ১টা পেঁয়াজ কুচি, হলুদগুঁড়ো, শুকনো লংকাগুঁড়ো অল্প তেঁতুল, নুন আন্দাজমতো।

প্রণালী : সবজিগুলোকে ১ ইঞ্চি চৌকো করে কেটে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে তাতে সরষে, কারিপাতা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে লালচে করে ভেজে নিয়ে সব সবজি দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে নরম হওয়া পর্যন্ত। এবার লংকা, হলুদগুঁড়ো দিয়ে নারকেল, তেঁতুলগোলা দিয়ে দিতে হবে। মশলা কষে যাওয়ার পরে ১.৫ কাপ জল এবং নুন দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। জল গা মাখা হয়ে এলে গরম গরম পরিবেশন করা যাবে ভাতের সঙ্গে (মিষ্টি পছন্দ হলে সামান্য গুড় মেশাতে পারেন)।

দক্ষিণী উপমা

উপকরণ : সুজি ১ কাপ, কড়াইশুঁটি, গাজর, বিনস, আলু ছোট ছোট টুকরোয় কাটা (হাল্কা ভাপিয়ে নেওয়া) নুন ১ চা চামচ, শুকনো লংকা ১.৫ চা চামচ, সাদা তেল ২ টেবল চামচ, সরষে ও কারিপাতা ফোড়নের জন্য। লেবুর রস ১ চা চামচ।

প্রণালী : কড়াইতে সাদা তেল গরম করে তাতে সরষে, কারিপাতা ফোড়ন দিতে হবে। এতে সুজি হাল্কা করে ভেজে নিতে হবে। এবার ভাপিয়ে নেওয়া সবজিগুলো দিয়ে দিতে হবে। মিনিট ২-৩ নাড়াচাড়া করে ১ কাপ জল দিতে হবে। আন্দাজমতো নুন, লংকা এবং লেবুর রস মিশিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

তেঁতুলের চাটনি

উপকরণ : তেঁতুলের পেস্ট তিন টেবল চামচ, ভাঙা কাজুবাদাম ১ চা-চামচ, কিশমিশ ১ চা-চামচ, ১/২ কাপ চিনি। সাদা তেল ১ টেবল চামচ, ১/২ চা-চামচ গোটা জিরা, ২টো গোটা শুকনো লংকা।

প্রণালী : কাজুবাদাম অল্প গরম জলে ভিজিয়ে রেখে কিশমিশের সঙ্গে বেটে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে জিরে, শুকনো লংকা ফোড়ন দিয়ে আঁচ কমিয়ে কাজুবাদাম, কিশমিশের পেস্ট দিয়ে দিতে হবে। তাতে ১ কাপ জল দিতে হবে সঙ্গে, চিনি এবং আন্দাজমতো নুন দিয়ে দিতে হবে। ফুটে উঠলে নামিয়ে নিতে হবে। (দইবড়া, আলু বন্ডার সঙ্গে পরিবেশন করা যায়) ⌘⌘

কেনাকাটা

ফরাসিতে ওদ-তোয়ালেৎ-এর অর্থ সুগন্ধী জল। অনেকে আবার অ্যারোমাটিক ওয়াটারও বলেন। অ্যালকোহল মিশ্রিত এই সুগন্ধী জল মূলত স্নানের পর স্কিন ফ্রেশনার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে পাঁচশো বছর ধরে। শোনা যায় রানি ক্লিওপেট্রা স্নানের পর যখন তাঁর প্রেমিক মার্ক অ্যান্টনির কাছে আসতেন, অ্যান্টনি নাকি দূর থেকেই ক্লিওপেট্রার সৌরভে পাগল হয়ে যেতেন। আবার নেদারল্যান্ডসের রাজকন্যা নাকি স্নানের জলে এক বোতল শ্যাম্পেন ঢেলে স্নান করতেন— ওদ-তোয়ালেৎ বা ওডি টয়েলেট নিয়ে এমনই অনেক মুখরোচক গল্প ছড়ানো আছে সারা বিশ্বে। যারা সুগন্ধ ভালবাসেন, স্নানের পর নিজেকে সুরভিত রাখতে চান সেই সব নারী-পুরুষের বিশেষ পছন্দের কয়েকটি বিশ্বমানের সুগন্ধীর হালহদিশ এখানে জানানো হল। জানালেন বুবুন চট্টোপাধ্যায়

গন্ধবিচার

নারীদের পছন্দ

এক্সাইটেড ল্যাপিডাস

যে সুন্দরীরা পারফিউম অবসেস্‌ড। ভাল সুগন্ধীর জন্য পৃথিবী ওলট-পালট করে দিতে পারেন তারা অবশ্যই ট্রাই করুন এই সুগন্ধীটি। ৫০ মিলির দাম- ২০৫০ টাকা।

ব্লু পারফিউম

স্নানের পর কানের পাশে অল্প করে ছড়িয়ে দিন। ব্যাস আর দেখতে হবে না। ১২৫ মিলির দাম ১২৯৯ টাকা।

ভ্যালেন্টিনো ক্লাসিক

সন্ধেবেলা পার্টিতে যাওয়ার আগে প্রসাধন সেরে ঘড়ি পরার আগে আলতো করে রিস্টে ঘষে নিন। ৭৫ মিলির দাম- ১৯৯৯ টাকা

ক্যারোলিনা হেরারা

যারা কখনই উগ্র সাজ পছন্দ করেন না। সবসময় ছিমছাম পোশাকেই স্বতন্ত্র থাকতে চান। তাদের মেজাজের জন্য একেবারে পারফেক্ট এই ইডিটি। ১০০ মিলির দাম ১৯৯৯ টাকা।

পুরুষদের পছন্দ

নাইকে ম্যান

ম্যাচো স্টিং পুরুষদের মধ্যে আরও একটু ওয়াইল্ডনেসকে উসকে দিতে চাইলে অবশ্যই এই ইডিটি-টি ট্রাই করুন। ১৫০ মিলির দাম- ৯৫০ টাকা।

মঁ-ব্লা

পছন্দ যাদের সবসময়ই রাজসিক, ব্র্যান্ডেড কোম্পানির জিনিস ছাড়া নাক সিটকোয় তারা অবশ্যই ওয়াড্রোবে এই অসামান্য ইডিটি-টি রাখুন। ৭৫ মিলির দাম- ২৭০০ টাকা।

ড্যাভিডফ কুলওয়াটার

একটু উড়নচণ্ডী, খামখেয়ালি কিন্তু রোম্যান্টিক পুরুষদের জন্য এমন একটি ইডিটির কোনও বিকল্প নেই। ১৭৫ মিলির দাম- ১৯৯৯ টাকা।

কেলভিন ক্লেন

পারফিউম বিলাসীরা এই অনন্ত কালের ইডিটি-কে আদর করে বলেন সিকে। ১০০ মিলির দাম ১৯৯৯ টাকা। ⌘⌘

নাইজেল আকারা। ইদানীংকালে বেশ পরিচিত নাম। বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী । ভাই ইউ কে-তে চাকরি করেন। ভাইয়ের বউ বায়ুসেনার অফিসার। নিজে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক। এরকম শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হয়েও জীবনের ন'টা বছর কাটিয়েছেন সংশোধনাগারে। সেখানেই হিউম্যান রাইটসের ওপর পোস্ট গ্রাজুয়েশন। অবশেষে অতীতকে মুছে আজ তিনি আলোর পথযাত্রী। আজ তাঁরই মুখোমুখি উপালি সাহা

'জীবন বার বার সুযোগ দেয় না'

প্র: স্কুলজীবনের গল্প বলবেন?

উ: আহামরি স্টুডেন্ট ছিলাম না। পরীক্ষায় ৭০ শতাংশ নম্বর পেতাম। এনসিসি করতাম। এছাড়াও রাগবি খেলেছি 'লা মার্টিনিয়ার্স ওল্ড বয়েজ ব্ল্যাক'-এর হয়ে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছি। একবার জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরি এসেছিলেন স্কুল পরিদর্শনে। তাঁকে দেখে ইচ্ছে হয়েছিল আর্মিতে যোগ দেওয়ার।

প্র: অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হলেন কী করে?

উ: কেউ যেচে আসে না। এর পেছনে কারও না কারও হাত থাকে। আমার ক্ষেত্রেও তাই। আর এই জগৎটা অ্যাডিকশনের মতো। একবার ঢুকলে বের হওয়া শক্ত।

প্র: কত বছর সংশোধানাগারে ছিলেন?

উ: প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পাঁচ বছর আর আলিপুরে চার বছর।

প্র: নিজের উত্তরণ ঘটালেন কীভাবে?

উ: ডিআইজি (কারা) বিডি শর্মা বলেছিলেন, নাচের ক্লাসে যোগ দিতে হবে। সেই মতো 'মা' অলকানন্দা রায় আসেন নাচের ক্লাস নিতে। প্রথমে রাজি হইনি। মা-ও কোনওদিন জোর করেননি। পরে ওঁর আচরণে কনভিন্সড হয়ে নিজে থেকেই যোগ দিই। ধীরে ধীরে ভালো লেগে যায়।

প্র: নাচের ক্লাস করতে করতেই মনের পরিবর্তন ঘটল?

উ: মা আমাদের দিয়ে প্রথমে সংশোধনাগারে বাল্মিকী-প্রতিভা করান। ২০০ দর্শক অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন। তাঁরাই প্রথম শিল্পীর স্বীকৃতি দেন। তখন থেকেই ভাললাগা শুরু। ২০০৭ সালে রবীন্দ্রসদনে বাল্মিকী-প্রতিভা অনুষ্ঠিত হবে ঠিক হয়। অন্যরা অনুমতি পেলেও আমি পাইনি। ব্যাড কনডাক্টের জন্য। তারপর পিটিশন দিয়ে অনুমতি পাই অংশগ্রহণের। অনুষ্ঠানের আগের দিন স্টেজ রিহার্সের সময় ফাঁকা হলে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমি কি আদৌ এতটা পাওয়ার যোগ্য? ভাবতে ভাবতে অঝোরে কেঁদে ফেলি। আর সেদিন থেকেই ঠিক করি আর পুরনো জীবনে ফিরব না । এরপর ২০০৯ সালে সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাই।

প্র: মাকে প্রথমবার দেখে কী মনে হয়েছিল?

উ: মনে হয়েছিল, হয় তিনি কোনও ডাক্তার। আমাদের দেখতে এসেছেন। নয়তো নির্ঘাত পাগল। না হলে কেউ অপরাধীদের নাচ শেখাতে আসে!

প্র: তাহলে অপরাধীদের শাস্তি না দিয়েও শোধরানো সম্ভব?

উ: শাস্তি তো অপরাধীরা পাচ্ছেই। জেলে বন্দী হয়ে। পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। তবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেরও দরকার আছে। বাল্মিকী-প্রতিভার পরেই কিন্তু বন্দিদের প্যারোলে ছাড়া হচ্ছে পাঁচদিনের জন্য। ওরা ফিরেও আসে সময় মতো। ওদের আরও এডুকেশন দরকার। আর দরকার বিনা পরিশ্রমে বসিয়ে না রেখে কাজের মধ্যে রাখা। অলসভাবে থাকলেই মাথায় বদ চিন্তা ঘুরবে।

প্র: ছাড়া পাবার পর সমাজ আপনাকে কীভাবে গ্রহণ করল?

উ: প্রথমে কেউ ঘরের কাজ দিত না। বাইরের কাজ করাত। মা

বলেছিলেন, কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে। আমি বলেছিলাম, এই শহরে আমার দাগী পরিচয়। এখানে থেকেই সেই দাগ মুছব। তারপর ভাইয়ের থেকে লোন নিয়ে নিজেই 'কলকাতা ফেসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট সংস্থা' খুলি। এখন তাতে এক্স প্রিজনারদের ছ' মাসের কোর্স করিয়ে কাজ দিই।

প্র: অভিনয়ও তো করলেন। কেমন লাগল এই নতুন জগৎ?

উ: ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে। জগৎটা অনেক বেশি কমার্শিয়াল। বাণিজ্যিক কারণে অনেক সময়েই পুরো সত্য তুলে ধরা সম্ভব হয় না।

প্র: কো-অ্যাক্টরদের মধ্যে কার অভিনয় ভাল লেগেছে?

উ: দেবশংকর হালদার, খরাজ মুখোপাধ্যায়। খরাজদার থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

প্র: যারা ভাল হতে চায় অথচ সুযোগ পায় না তাদের কী বলবেন?

উ: জীবন আমাদের অনেকটা সময় দিয়েছে। ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই সুযোগ পাওয়া যাবে ভুল সংশোধনের। তবে জীবন কিন্তু বার বার সুযোগ দেয় না।

প্র: ভবিষ্যত নিয়ে কী ভাবছেন?

উ: সংস্থার আরও উন্নতি করা। যারা মূল স্রোতে ফিরতে চায় তাদের সাহায্য করা। আর আমার একটি হোম রয়েছে ১০ জন শিশুকে নিয়ে। এদের বাবা কিংবা মা জেলে। এরা যাতে আর পাঁচটা শিশুর মতো বড় হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

প্র: স্টেজ শো করবেন না?

উ: 'মা' অলকানন্দা রায়ের ইচ্ছে রয়েছে, সম্ভব হলে এই বছরের ডিসেম্বরে 'অশোকা' স্টেজ প্লাস স্ক্রিন দুটো মিলিয়ে শো করার। তাতে আমি থাকব স্ক্রিনে। সংশোধনাগারের শিল্পীরা থাকবেন স্টেজে।

প্র: ফিল্মের অফার এলে?

উ: অলরেডি ছ'টা অফার না করেছি। এখন টানা চার-ছয় মাস আর অভিনয় নয়। সংস্থার কাজে ব্যস্ত থাকব। তারপর হয়তো বছরে বড় জোর একটা কি দুটো ছবিতে অভিনয় করতে পারি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন সফল আর ব্যবসার জন্য করা লোন শোধ করার জন্য।

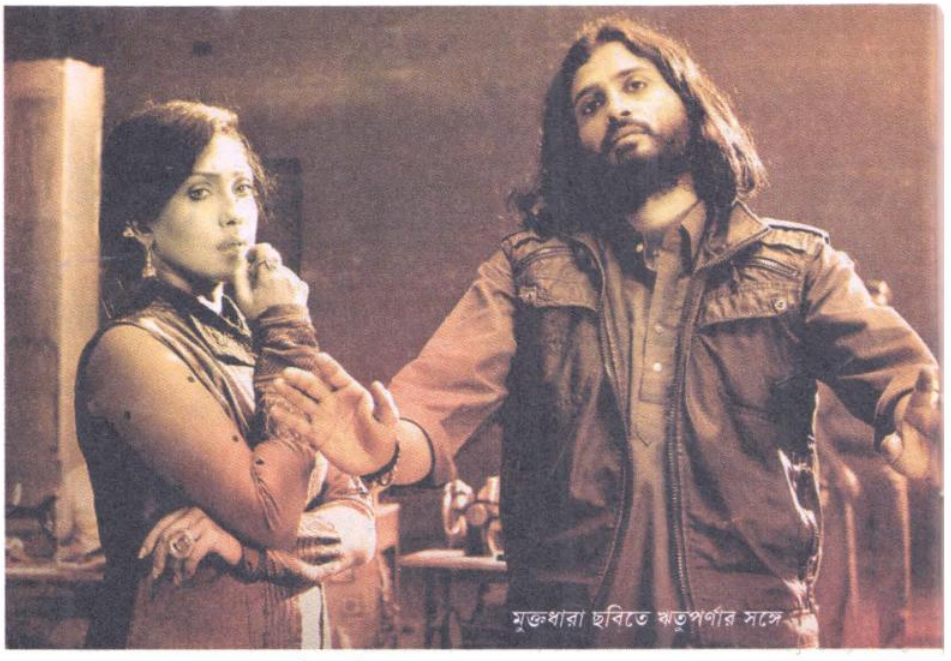
মুক্তধারা ছবিতে ঋতুপর্ণার সঙ্গে

প্র: সংসার করবেন কবে?

উ: এত ব্যস্ত যে প্রেম করারও সময় নেই। ওই দায়িত্ব দুই মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। সঙ্গে এটাও বলেছি, আমার অতীত, বর্তমান সব শুনে যদি কোনও মেয়ে স্বেচ্ছায় রাজি হয় তবেই বিয়ে করব।

প্র: সমাজের প্রতি কোনও মেসেজ?

উ: যাঁরা সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে মূলস্রোতে ফিরতে চান, সমাজের উচিত তাঁদের একবার সুযোগ দেওয়া। না হলে অপরাধীর সংখ্যা আরও বাড়বে।

প্র: আপনার প্লাস আর মাইনাস পয়েন্ট কী?

উ: কখনও, কোনও বিষয়ে হাল ছাড়ি না, হতাশ হই না। আর স্মোকিং ছাড়তে পারছি না। বিছানায় মাথা ঠেকালেই ঘুম আসে না। সোজাসুজি কথা বলায় অনেকে আঘাত পান। এটা চাই না।

প্র: অবসরে কী করেন?

উ: ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, সুফি গান শুনি। ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের বায়োগ্রাফি আছে। ওটা শেষ করার চেষ্টা করছি। আর লিখতে ইচ্ছে করে। যদিও এখনও কিছু লিখে উঠতে পারিনি।

প্র: সব মিলিয়ে জীবন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি?

উ: ওই ন'টা বছর সংশোধনাগারে না থাকলে আজকের নাইজেল তৈরি হত না।

এ সপ্তাহেই রিলিজ করছে 'রাজ-৩'

বিপাশাকে জড়িয়ে রয়েছে অশরীরী কয়েকটা হাত। কাউকে বলে দিতে হবে না, এটা 'রাজ ৩'-র পোস্টার। মহেশ ভাটেদের 'রাজ', 'রাজ-দ্য মিস্ট্রি' দুটোই হিট। সম্ভবত সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে মুক্তি পাবে এরই সিক্যুয়েল 'রাজ ৩'। তার আগেই নানা গুঞ্জন ছবিটি নিয়ে। একটি সাক্ষাৎকারে বলিউড ব্ল্যাক বিউটি বিপাশা বসু বলেছেন, তাঁর নাকি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল রাজ-৩ করতে গিয়ে। একটা হরর থ্রিলারে এমন কী থাকতে পারে, যা বিপাশার মতো পোড় খাওয়া নায়িকাকেও নাড়া দিয়েছে! জানা গিয়েছে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির করুণ অথচ ধ্রুব সত্যকে নাকি রাজ ৩-তে এতটাই খোলাখুলি তুলে ধরা হয়েছে যে, শুট যত এগিয়েছে বিপস তত শকড। এবং শেষে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল তাঁর।

বরাবরই অন ইয়্যুজুয়াল, সমাজের বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ছবি করেন ভাটেরা। পরিচালক বিক্রম ভাট ছবিতে তুলে ধরেছেন, বলিউডের এক নামী নায়িকার জীবনের উত্থান-পতনের ঘটনা। গল্পের মধ্যমণি সেই নায়িকা মৈথিলি (বিপাশা)। অভিনয় জীবনে তার অ্যাচিভমেন্ট এতটাই যে, বহু সেরা চরিত্রে অভিনয় করে একের পর এক পুরস্কার ঝুলিতে পুরেছেন। মৈথিলির সঙ্গে হ্যান্ডসাম চিত্র পরিচালক আদিত্যর (ইমরান হাসমি) ভালবাসা ছিল। কিন্তু একসময় তো নতুনদের জায়গা ছেড়ে দিতেই হয়। সেইমতো মৈথিলির কদর পড়তে থাকে নতুন নায়িকা সঞ্জনার (ইশা গুপ্তা) আগমনে। এবং আস্তে আস্তে মৈথিলিকে ভুলে যেতে থাকে সবাই। এমনকী প্রেমিক আদিত্যও। মৈথিলির পক্ষে এতটা আঘাত মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই নিজের জায়গা ফিরে পেতে এবং সঞ্জনার উত্থান রুখতে সাহায্য নেয় কালাজাদুর ।

গল্পটা মোটামুটি এই। কিন্তু এতে বিপসের এই রি-অ্যাকশন কেন? কারণ, ছবির প্রযোজক মহেশ ভাটের বক্তব্য, গোটা গল্পটাই নাকি বিপাশার জীবন নিয়ে। তাই আমি পোস্টার জুড়ে বিপাশাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। এটাই হাইপ করবে ছবিকে।

সাক্ষাৎকারে বিপসও স্বীকার করেছেন, সাধারণ মানুষ আমাদের জীবনটাকে গ্ল্যামারে মোড়া রূপকথার জগৎ মনে করে। এখানেও অনেক উত্থান-পতন, অন্ধকার দিক আছে— যা তাদের গোচরে আসে না। আমরাও হাসতে হাসতে সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ দিই। এইটা ছবির বিষয় হওয়ায় অভিনয় করতে করতে এতটাই ইনভলভড হয়েছিলাম যে, পরে নিজের অংশের শ্যুটে নিজের হাসি শুনে শিউরে উঠি। বিপাশাও তাহলে কী হারানো জায়গা ফিরে পেতে কালাজাদু করছেন নাকি? কখনোই না। ওসব ডেনজার জোনের ধারে পাশে আমি নেই— মন্তব্য বিপাশার। বরং আমি খুশি ১০ বছর বাদে আবার ভাট ক্যাম্পে ফিরে।

এদিকে পরিচালক আবার অন্য গল্প শোনাচ্ছেন। প্রাক্তন প্রেমিকা আমিশা প্যাটেলকে নিয়ে নাকি তাঁর এই ছবি। যাঁকে 'কহো না প্যায়ার হ্যায়', 'গদর এক প্রেম কহানি'-র পর ২০০৩ থেকে দর্শক সত্যিই ভুলে গেছে। রটনা যা-ই থাক, রাজ ৩ বলিউডের এই অন্ধকার দিকটাকেই ক্যাশ করেছে। 'জন্নত ২'-র নায়িকা ঈশা রাজ ৩-তে বিপাশার কো-স্টার। যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈশা জানিয়েছেন, বিপাশার সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না। অভিনয়ের সময় বিপাশা আর ইমরান দু'জনেই কিছুটা হলেও প্রেশার ক্রিয়েট করেছেন। তবুও ওঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কোনও নার্ভাসনেস ফিল করিনি। কারণ, এই মুহূর্তে ডিফারেন্ট টাইপের রোলে কাজ করতে চাইছি। 'জিসম ২' বা 'রাজ ৩'-র মতো। যাতে চট করে দর্শকের মনে জায়গা করে নিতে পারি। রোল ছোট হলেও আপত্তি নেই। ছবিতে ইমরান হাসমির গুরুত্বও কম নেই। কেননা, আদিত্য-র চরিত্র মূলত বিক্রমের আদলেই তৈরি।

রাজ ৩-র মিউজিকে নাকি ইজিপশিয়ান গানের ছায়া রয়েছে— এমনটাও শোনা যাচ্ছে। বাংলার সুরকার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ছবির সুরকার। তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এবং যথেষ্ট আশাবাদী, শ্রোতাদের গান ভাল লাগবে। যেমন, টাইটেল ট্র্যাক 'দিওয়ানা কর রাহা হ্যায়' ইতিমধ্যেই ছাপ ফেলেছে। বাংলা 'আওয়ারা' ছবির 'পড়লে মনে তোমাকে' হিন্দিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও ভালই সাড়া ফেলেছে 'কেয়া কাজ হ্যায়', ' রাফতা রাফতা', 'ওহ মাই লাভ', 'জিন্দেগী সে' ইত্যাদি গান। শোনা যাবে শ্রেয়া ঘোষাল, জুবিন গর্গ, কেকে, সোনু নিগম, জাভদ আলি, সাফকাত আলি খানের গলায়। জিৎ ছাড়াও সুর দিয়েছেন মিঠুন আর রশিদ। বিপাশা বসু, ইমরান হাসমি, ঈশা গুপ্তা ছাড়াও রাজ ৩-এ আছেন জ্যাকুইলিন ফার্নান্ডেজ, আনন্দ এবং জিশান খালিদ। প্রযোজনায় মহেশ ও মুকেশ ভাট। কাহিনিকার সগুফতা রফিক। রাজ ৩ রিলিজ করার কথা ছিল ৩১ আগষ্ট। ওই দিনেই 'বরফি' আর 'জোকার'-এর রিলিজ ডেট পড়ায় ভাট ক্যাম্প রিলিজ ডেট পিছিয়ে দিতে বাধ্য হন। ⌘⌘

উপালি সাহা

নটসেনার 'শেষ কথা'

প্রদীপ মিত্র

বাংলা নাটক দেখেন আর নটসেনার 'গোরুর গাড়ির হেডলাইট' দেখেননি এমন দর্শক খুব কমই আছেন। খুব সম্প্রতি নাটকটির ১২৪১ তম অভিনয় হয়ে গেল অ্যাকাডেমিতে। সেদিনই দুপুরে মঞ্চস্থ হয় নটসেনার নতুন নাটক 'শেষ কথা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন মিহির চৌধুরি। অরণ্যের ভিতর হেঁটে যায় এক নারী। পাতায় পাতায় শিসধ্বনি। সে কান পেতে থাকে। ওই ধ্বনির জন্য। গানে গানে কেটে যায় তার বেলা। কখনও দিনলিপির পাতায় নিবিষ্ট সে। ছোটনাগপুরের প্রত্যন্তে অধ্যাপক দাদু অনিলকুমার সরকার ও নাতনির এক অমলিন খুনসুটির জীবন। নির্জনতার ভেতর সে টের পায় পাথর কুড়োনোর শব্দ। সে দেখে এবং দেখেও না ওই পাগল-পুরুষটিকে। সারাদিন পাথর কুড়োনোর আনন্দে বিভোর এক পুরুষ। একদিন নারীটির ছিনতাই হয়ে যাওয়া ডায়েরি ও ব্যাগটি ছিনতাইকারীর হাত থেকে উদ্ধার করে আনে ওই পুরুষটি। নারী ভাবে ডাকাতি। নারীটির নাম অচিরা। আর, পুরুষটি স্বনামধন্য ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী নবীনমাধব সেনগুপ্ত। ঘটনাটি তাঁদের ভিতরের নৈঃশব্দ ভাঙে। তাঁরা একে অপরকে চিনতে চায়। জীবনে জীবন জড়িয়ে নিতে চায়। গল্পের ও নাট্যরূপের এই চলনে দর্শকও যখন জড়িয়ে যেতে থাকে, ঠিক তখনই অচিরা এক অন্য মুক্তির আনন্দে মেতে ওঠে। যে মুক্তি কোনও নারী-পুরুষের বন্ধনে জড়ায় না। যেখানে অন্য আলো, অন্য ভুবন খেলা করে। আর সেই আলো যেন মঞ্চ জুড়ে বেজে ওঠে আমার মন কেমন করে... গানটির ধ্বনিতে। 'শেষ কথা' নাটকের থিম-সঙটি ঘুরে-ফিরে এসেছে ঘটনাপ্রবাহের দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে। অচিরার ভূমিকায় স্বাতী কোলের কণ্ঠে। বড় বেদনার মতো বড় আনন্দের ধ্বনি হয়ে বেজে উঠেছে যেন! নবাগতা স্বাতী রবীন্দ্র-গল্পের নারী চরিত্রে মগ্ন থেকেছেন শেষ পর্যন্ত। অভিনয়ের দীপ্তিতে। আর ভূ-বিজ্ঞানীর স্বদেশ চেতনা ও চিন্তার ডানা বিস্তারের জন্য যে অন্য আলোয় মুক্তির ব্যঞ্জনা— সেই ভূ-বিজ্ঞানী নবীনমাধব সেনগুপ্তের চরিত্রে তীর্থঙ্কর ঘোষের অভিনয় নাটকটির প্রাণ হয়ে ওঠে। নির্দেশক দুর্গা চক্রবর্তী। সায়ন্তনী নাগের মঞ্চভাবনা নাটকের শরীরে ভীষণ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। সারা মঞ্চ জুড়েই পত্রমর্মরের ধ্বনি। নেপথ্যে আর্যা চক্রবর্তীর কণ্ঠে গানটি চমৎকার। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি যে আমার নয়'— এই অমোঘ উচ্চারণ থেকে দূরে সরে যায় নাটকের চলন, গল্পের চলন। 'তিনসঙ্গী' গল্পের এই চলনকে যথার্থ নাট্যরূপে গেঁথেছেন মিহির চৌধুরি। পরীক্ষামূলক ভাবনা থেকে দূরে ন্যাটকার ও নির্দেশক 'শেষ কথা'-কে দুই দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। একদিকে মায়াবী স্বপ্ন ও অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমই 'শেষ কথা'-র

শেষ কথা হয়ে থাকতে পেরেছে। বন্ধনহীন মুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ও সেই সময়ের নিরিখে অন্তত এই গল্পে এভাবেই দেখেছেন। অধ্যাপক চরিত্রে উদয়ন চক্রবর্তী বেশ সপ্রাণ। বঙ্কিমদা দীপঙ্কর চক্রবর্তী, দেবীকা প্রসাদ দেবব্রত ভট্টাচার্য, ভৃত্য বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, স্বদেশি তাপস দত্ত চৌধুরি ও মা অম্ভিকা চ্যাটার্জি চরিত্রানুগ ও সহজ-স্বচ্ছন্দ। অম্ভিকা চ্যাটার্জির পোশাক-ভাবনা নাটক ও চরিত্রের সময়-সম্পৃক্ত ও যথার্থ হয়ে উঠেছে। উত্তীয় জানার আলো ও অনুরূপ মল্লিকের আবহ নাটকের শিল্পিত ভাবনার অনুষঙ্গী। বিজড়িত ধ্বনির মতো বেজে যায় স্বাতী কোলের সুমধুর কণ্ঠের 'আমার মন কেমন করে / ..কে জানে - কে জানে / আমার মন কেমন করে..! ⌘⌘

সোনাবাবু 'দেবোত্তম' দেবদাসের অপেক্ষায়

'সোনাবাবু' নামে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। নজর কেড়েছেন বিভিন্ন পরিচালকের। ২০১২ টেলিসম্মানে সেরা জনপ্রিয় অভিনেতার পুরস্কারটি কিছুদিন আগেই পকেটে পুরে ফেলেছেন তিনি। জি বাংলার জনপ্রিয় সিরিয়াল 'কেয়াপাতার নৌকা'র সোনাবাবু আর 'সাত পাকে বাঁধা' ধারাবাহিকের 'অপু'র আসল নামটি দেবোত্তম মজুমদার । এখনও পর্যন্ত তিনি মেট্রো, অটো নিদেনপক্ষে ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করতে ভালবাসেন। আজ দেবোত্তমের মুখোমুখি **দীপা চৌধুরি**

প্র: ২০১২ টেলিসম্মানে 'সেরা জনপ্রিয়' অভিনেতার পুরস্কার পাচ্ছেন জেনে কীরকম অনুভূতি হয়েছিল?

উ: প্রথমে জানিয়ে রাখি 'কেয়াপাতার নৌকো' আমার প্রথম সিরিয়াল নয়। ২০০৯ সালে ইটিভিতে 'কখনও মেঘ কখনও বৃষ্টি' সিরিয়ালে প্রথম অভিনয় করি। সে বছর টেলিসম্মানে নতুন মুখ বিভাগে নমিনেটেড হয়েছিলাম, কিন্তু পুরস্কার পাইনি। কিন্তু সেটা খুব এক্সাইটমেন্ট ছিল। এবছর আমার সঙ্গে অনেক গুণী অভিনেতারাও নমিনেশন পেয়েছিলেন। দর্শকদের একটা ভোট হয়েছিল, তাতেই সেরা জনপ্রিয় অভিনেতার পুরস্কারটি আমার কপালে জোটে। আমি কখনওই ভাবতে পারিনি পুরস্কার পাব। সত্যি খুব ভাল লেগেছে। আসলে দর্শকদের জন্যই তো অভিনয়টা করা।

প্র: তার মানে রাস্তা-ঘাটে এখন সোনাবাবুকে সবাই চিনছে—

উ: (হেসে) হ্যাঁ চিনছে ... । আগে মনে হত চিনতে পারছে না কেন? অনেকেই এসে কথা বলেন, ভাল লাগে। আবার কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সমস্যা হয়। অনেকেই এসে জিজ্ঞাসা করেন সিরিয়ালে পরবর্তী ক্ষেত্রে কী হবে! তখন উত্তর দেওয়ার কিছু থাকে না। কারণ আমরা অভিনেতারা জানতে পারি না কী হতে চলেছে, স্পটে গিয়ে স্ক্রিপ্ট পাই ... । তবে লোকজনের এই এক্সসেপটেন্সটা সত্যি এনজয় করি।

প্র: এত চ্যানেল, এত সিরিয়াল তার মধ্যে অনেকেই ভাল অভিনয় করছেন— এসবের মধ্যে দেবোত্তম নয়, 'সোনাবাবু' বলে আলাদা আইডেনটিটি তৈরি হওয়া এটাকে কী বলবেন আপনি?

উ: কেয়াপাতার নৌকো সিরিয়ালের স্ক্রিপ্টরাইটার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে 'সোনাবাবু' হয়ে উঠতে ভীষণভাবে হেল্প করেছেন।

প্র: সোনাবাবুকে কি কেয়াপাতাতে নির্বাচন করার পর কোনও ওয়ার্কশপ করতে হয়েছিল?

উ: না, আমায় কোনও ওয়ার্কশপ করতে হয়নি, সেটা কিরণমালা (ঈপ্সিতা) বা ময়নাকে করতে হয়েছে।

প্র: বাঙাল ভাষায় কথা বলতে অসুবিধা হয়নি?

উ: আমাকে ডেকে যখন স্ক্রিপ্টটা শোনানো হয়, আমি বলেছিলাম আমি পারব না। আমরা বাঙাল হলেও বাড়িতে বাবা-মা কেউই এই ভাষায় কথা বলেন না। একটু ভয় পেয়েই বলেছিলাম বাঙাল ভাষা আমি বলতে পারি না। তখন ওরাই (ডিরেক্টর) আমাকে বলেছিলেন ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙাল ভাষায় যে কমেডি আছে সেগুলি খুব মন দিয়ে শুনেছিলাম তখন। তারপর আস্তে আস্তে ভাষাটা আমার গ্রিপে আসে ... । তবে এখনও মাঝে মাঝে অসুবিধা হয় কিছুটা।

প্র: শুনেছি আপনি নাটকের লোক—

উ: হ্যাঁ, আমি ছোট থেকেই থিয়েটার করতাম। আমাদের পাড়ার একটা দল ছিল নাম 'হুজুগ'। এখন আর সেটা নেই। ২০০৭ সালে তমাল রায়চৌধুরি প্রোডাকশনে 'যুধিষ্ঠিরের জুয়া ও আমরা' নাটকে কাজ করি। বছর চারেক সেখানে ছিলাম। দু'হাজার দশের পরে সিরিয়ালের কারণে আর নাটকে সময় দিতে পারিনি। এখনও খুব ইচ্ছে করে নাটক করতে। খুব মিস করি।

প্র: তাহলে নাটক প্রথম প্রেম?

উ: আমার প্রথম প্রেম গান। আমি গান গাইতে খুব ভালবাসি। ক্লাসিক্যাল শিখতাম পণ্ডিত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। গানটা করতে পারি একটু আধটু। গানটা সিরিয়াসলি শিখলাম, কিন্তু হয়ে গেলাম অভিনেতা।

প্র: আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন—

উ: আশুতোষ থেকে ইকনমিক্স অনার্স নিয়ে পড়েছি। তারপর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি করতাম। পাশাপাশি নাটক চলছিল। ২০১০-এ চাকরি ছাড়ি। তখন সিরিয়ালের থেকে ডাক আসছিল। অভিনয়ের প্রতি ভালবাসাটাই কেরিয়ার হয়ে গেল।

প্র: বাড়ির সমর্থন পেয়েছেন? চাকরি ছেড়ে সিরিয়ালে অভিনয় করছেন—

উ: আমার মায়ের এ ব্যাপারে এখনও টেনশন আছে। এই লাইনে অনিশ্চয়তা সব সময় রয়েছে। সে কারণে মেগা সিরিয়ালের ডাক উপেক্ষা করে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম।

প্র: প্রথম সিরিয়ালে অভিনয়ের যোগাযোগ হল কী করে?

উ: স্নেহাশিস চক্রবর্তীর প্রোডাকশনে ছবি দিয়ে এসেছিলাম। উনি আমায় ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন— তোমার ছবির মতোই কি তোমার চেহারা? যদি তাই হয় তোমাকে আমি হিরো বানিয়ে দেব। সেই আমার শুরু। 'কখনও মেঘ কখনও বৃষ্টি'-তে কাজ শুরু করি। তারপর থেকে আমাকে আর নিজে থেকে কোথাও যোগাযোগ করতে হয়নি। ঋতা কয়রালের সুপারিশে 'সাত পাকে বাঁধা'-তে অভিনয় করি। তারপর ভেঙ্কটেশের 'সুভাষিণী' সিরিয়ালে অভিনয় করি।

প্র: সোনাবাবুর চরিত্র এবং ডা. অপুর চরিত্রে একটা মিল আছে— সেটা ডিফারেনশিয়েট করেন কিভাবে?

উ: ভীষণ মিল আছে। অনেকেই বলেন এই দুটো চরিত্রে আমাকে একরকম লাগে। আসলে দুটো চরিত্র কিন্তু দুটো পিরিয়ডের। সোনাবাবু সত্তর দশকের প্রথমদিকের এবং ডা. অপু একদম এই সময়ের। দুটো চরিত্রের মানসিক গঠনে কিছুটা মিল হয়তো আছে। কারণ দুজনেই শিক্ষিত। ডা. অপু করতে গিয়ে আমি আর্টিফিসিয়ালি কোনও কিছু চাপিয়ে দিতে চাইনি। তবে চাকরি জীবনে ডাক্তার এত ঘেঁটেছি যে, যখন স্টেথো দিয়ে রুগি দেখি বা ইঞ্জেকশনের সুচ ফোটাই তখন আসল ডাক্তার হওয়ার চেষ্টাই করি।

প্র: আপনার কোনও স্বপ্নের চরিত্র আছে? যা করতে পারলে খুশি হবেন।

উ: দেবদাস আমার স্বপ্নের চরিত্র। বাংলা উপন্যাসে দেবদাসের মতো দুর্বল এবং ট্র্যাজিক চরিত্র খুব বেশি নেই। আমার কোথাও যেন মনে হয় সোনাবাবুর সঙ্গে দেবদাসের কিছুটা হলেও মিল আছে। হয়তো কোনও জায়গায় সোনাবাবু একটু বেশি বোল্ড। এই চরিত্রটা করে দেবদাস করার আশ কিছুটা হলেও মেটে।

প্র: তার মানে ট্র্যাজিক চরিত্র পছন্দ আপনার।

উ: আসলে আমার মনে হয় ট্রাজিক ক্যারেক্টার করতে গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় অভিনয়ের স্কোপ থাকে। পারি কী না পারি সেটা পরের কথা। কিরণের প্রতি সোনাবাবুর পজেসিভনেস কোথাও দেবদাসের পার্বতীর প্রতি যে পজেসিভনেস ছিল সেটাকে টাচ করে।

প্র: সিনেমার অফার আসেনি?

উ: দেবানিক কুণ্ডুর 'রঙিন গোধূলি'তে কাজ করেছি। তারপর কাজ করছি 'তিন তনয়া' ছবিতে। সম্প্রতি কাজ করছি রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' ছবিতে। পরিচালক নীতিশ মুখোপাধ্যায়। সুকুমার নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছি। গল্পে সুকুমারের বিশেষ ভূমিকা নেই। নীতিশ মুখোপাধ্যায় মূল দুটি চরিত্র অতীন-এলার পাশাপাশি সুকুমার-উমা এই চরিত্র দুটি ডেভেলপ করেছেন। অন্যরকমভাবে ইম্পর্টেন্স পেয়েছে।

প্র: অন্য কোনও ছবির অফার নেই?

উ: মধ্যে মধ্যে অফার পাই। কিন্তু ভাল হাউস, ভাল ডিরেক্টর ছাড়া কাজ করতে চাইছি না এখনই। মেগা সিরিয়াল আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত এই মুহূর্তে যে কোনও ছবিতে অভিনয় করে সিরিয়াল হ্যাম্পার করতে পারব না। কারণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এটি।

প্র: কাদের সঙ্গে কাজ করতে চান?

উ: আমার খুব ইচ্ছে ঋতুপর্ণ ঘোষ, অঞ্জন দত্ত, সৃজিত মুখার্জি, মৈনাক ভৌমিক এদের সঙ্গে কাজ করার। আমার কৌশিক গাঙ্গুলির কাজ খুব ভাল লাগে। এরকম অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

প্র: পুরস্কার পাওয়ার পর ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছে কেউ?

উ: না, সেরকমভাবে ফোন করে কেউ কনগ্র্যাটস করেনি। আমাদের ইউনিটের অনেকেই আগে থেকে জানতেন, তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। খুব কাছের লোক ছাড়া আমি কাউকে আগে থেকে খবরটা জানাইনি।

প্র: সিনিয়ররা সাজেশন দেন অভিনয়ের ব্যাপারে?

উ: দেবেশ চট্টোপাধ্যায় খুব হেল্প করেছেন আমাকে। শঙ্কর চক্রবর্তীও বাঙাল। তাই বাঙাল ভাষার যে টানটা কিভাবে বলব এদের কাছে খুব হেল্প পেয়েছি। আমার একটা আবৃত্তি করার ছিল, যেটা আমি একদম পারি না। দেবেশদা বললেন, আবৃত্তি করতে হবে না। মানেটা বুঝে বলে যা ... এই রকম আর কী। আর একটা ঘটনা না বললেই নয়, ভাস্কর ব্যানার্জি একদিন রাতে ফোন করে বললেন, 'আজ যে শটটা দিলি এরকম না হয়ে একটু অন্যরকম হলে ভাল হত। এরকম ক'জন সিনিয়র বলেন। এভাবেই সোনাবাবু আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

প্র: প্রিয় অভিনেতা কে?

উ: চার্লি চ্যাপলিন, রিচার্ড গেয়ার, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পরেশ রাওয়াল— এরকম অনেকেই আছেন।

কেয়াপাতার নৌকার একটি দৃশ্যে

প্র: ফ্যান-মেল পান? মেয়েরা এসএমএস করে?

উ: প্রচুর পাই। আট বছর স্ট্রাগল করেছি ইন্ডাস্ট্রিতে আসার জন্য। এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাল লাগে।

প্র: বান্ধবী রি-অ্যাক্ট করে না?

উ: একদম না। ও বরং খুশি হয়। এমনকী টিভিতে রোম্যান্টিক দৃশ্য দেখে আমাকে বলেছে একদম আর্টিফিসিয়াল হয়েছে।

প্র: ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর দেবোত্তম ব্যক্তিগত জীবনে নিজেকে কতটা পালটেছে?

উ: আমার কোনও চেঞ্জ হয়নি। আমার মনে হয় গ্রুপ থিয়েটার থেকে যে সব ছেলেমেয়ে এই রঙিন জগতে আসে তাদের পা-টা মাটি ছুঁয়েই থাকে, কারণ আমাদের গ্রুমিংটা সেরকমই।

প্র: এটা বিনয়?

উ: একদমই নয়। আমি বলতে চাইছি অভিনেতারা যখন রাস্তাঘাটে মবড হয়, তখন তারা স্টার হয়ে যায়। আমি সে পর্যায়ে যাইনি। লোকে একটু আধটু চিনে ফেলে মাঝে মধ্যে। কিছু সুবিধাও পাই। মবড হতে আমরা সবাই ভালবাসি।

প্র: সুবিধা! যেমন—

উ: ব্যাংকে গিয়ে তাড়াতাড়ি অ্যাকাউন্ট খুলতে পেরেছি। যদিও আমি অনেক দেরি করে ব্যাংকে গিয়েছিলাম। ⌘⌘

এবার কব্জির ভেলকি দেখাবেন কে?

অভিরূপ দত্ত

ইডেন টেস্টে ২৮১ রান করার পর ভি ভি এস লক্ষ্মণ

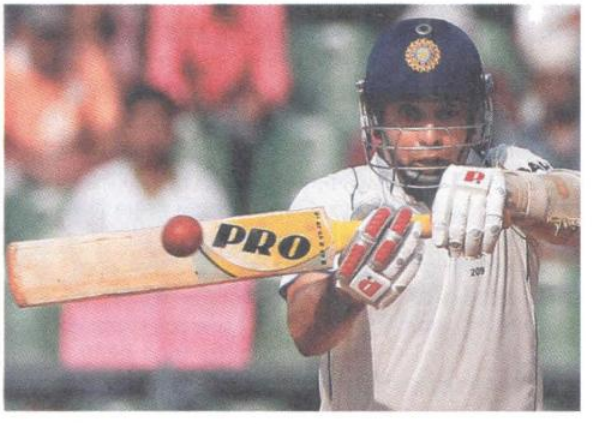

কব্জির একটা সূক্ষ্ম মোচড়। তার পরই অফ সাইডের বল দুরন্ত গতিতে ছুটে গেল স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারির দিকে। অথবা, মিডল স্টাম্পের উপর গুড লেংথের বল সবাইকে বোকা বানিয়ে লেগ গ্লান্স। কেবল কব্জির কেরামতিতেই গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে সম্মোহিত করে রেখেছিলেন তিনি। ক্রিকেট জীবনের প্রায় অর্ধেক রানই করেছেন কব্জির জাদুতে। তিনি ভি ভি এস লক্ষ্মণ। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা লোয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। সম্প্রতি এই হায়দরাবাদি ব্যাটসম্যান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ক্রিকেটপ্রেমীদের আচ্ছন্ন করেছেন নস্টালজিয়ায়। প্রায় বিশ্রামে থেকে অবসরের ঘটনা, তাঁর মতো ক্রিকেটারের পক্ষে অসম্মানের। বিতর্কিতও বটে। এই লেখার বিষয় অবশ্যই সেই বিতর্ক নয়। মহম্মদ আজহারউদ্দিন যে ব্যাটিং শিল্পের আমদানি করেছিলেন ক্রিকেট দুনিয়ায়, ভেঙ্কিপুরম ভেঙ্কটসাই লক্ষ্মণ সেই শিল্পেরই আপাতত শেষ সম্রাট। আজহারউদ্দিনের মতো মহাতারকা হয়তো কোনওদিন হয়ে উঠতে পারেননি লক্ষ্মণ। কিন্তু, ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান অস্বীকার করার স্পর্ধা সম্ভবত কারও হবে না। যাঁরা ভি ভি এসের উগ্র সমালোচক, তাঁরাও একাধিকবার মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন এই হায়দরাবাদির ব্যাটিং শৈলীর।

সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল কুম্বলে এবং ভি ভি এস লক্ষ্মণ— গড়াপেটা বিধ্বস্ত ভারতীয় ক্রিকেটকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার কাণ্ডারি এই পঞ্চপাণ্ডব। কেবল তাই নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন আইকন হিসেবে। দ্রাবিড়, কুম্বলে এবং সৌরভ আগেই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন অবসরের গ্রহে। এবার পা রাখলেন লক্ষ্মণও। যাঁর ব্যাটে একাধিকবার আটকে গিয়েছে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপের ধস। ইডেনে স্টিভ ওয়ার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর খেলা ২৮১ রানের ইনিংস তো ক্রিকেট রূপকথায় চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। ইনিংস পরাজয়ের ভ্রুকুটি উড়িয়ে দলকে অতিমূল্যবান জয় এনে দেওয়া সেই ইনিংস যতটা আলোচিত, লক্ষ্মণের অন্য ধ্রুপদী ইনিংসগুলি ততটা নয়। আসলে, ২৮১ রানের সেই ইনিংস এখনও চোখে লেগে রয়েছে ক্রিকেট জনতার। একটা তথ্য অনেকেরই অজানা, তা হল ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন হলেন লক্ষ্মণের প্রপিতামহ। তাই ছোট থেকেই জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত লক্ষ্মণ। গড়াপেটা বিধ্বস্ত ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য ঠিক যা প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্মণকে কেবল দারুণ ব্যাটসম্যান বললে, একটু ভুলই বলা হয়। তিনি একজন বিশ্বমানের স্লিপ ফিল্ডারও বটে। শুকনো পরিসংখ্যান দেখে লক্ষ্মণের মতো ক্রিকেটারকে মাপতে যাওয়া নিছক বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কারণ, সিংহভাগ সময়ই ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপে তাঁর জায়গা হয়েছে ছয় নম্বরে। অর্থাৎ, তাঁর পরই শুরু হয়েছে লেজ। কখনও দ্রাবিড়, কখনও সচিন বা সৌরভকে বাইশ গজে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু, অধিকাংশ সময়ই তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে বোলারদের নিয়ে। ব্যাটিং অর্ডারের উপরের দিকে ব্যাট করার সুযোগ পেলে, তাঁর নামের পাশে নিশ্চিতভাবেই আরও কয়েক হাজার রান জমা পড়ত।

সৌরভ অবসর নেওয়ার বহুদিন পর পর্যন্ত যথাযথ বিকল্প পায়নি ভারতীয় ক্রিকেট। দ্রাবিড়ের জায়গা কে নিতে পারেন, তা নিয়ে এখনও

চলছে জল্পনা। এর মধ্যেই লক্ষ্মণের অবসর ভারতীয় ক্রিকেট কর্তাদের চিন্তা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল। লোয়ার মিডল অর্ডারে হায়দরাবাদি তারকার জুতোয় পা গলানোর মতো কাউকে এবার দরকার। ক্রিকেটের নিয়মে সেই জায়গা নিশ্চয়ই পূরণ হবে। কিন্তু, কে কবে এই শূন্যস্থান ভরাট করবেন, সেটাই এই মুহূর্তে সবথেকে বড় প্রশ্ন। জাতীয় দলে লক্ষ্মণের জায়গা নেওয়া কঠিন, নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন। দেশে তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটারের অভাব নেই। কিন্তু, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পাওয়া সাফল্য আর আন্তর্জাতিক পর্যায় দেড় দশক টিকে থাকা এক জিনিস নয়। এই ভাবনার দায়িত্ব তোলা থাক ক্রিকেট প্রশাসকদের জন্য। আমরা সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীরা আপাতত লক্ষ্মণেই মজে থাকতে চাই। লক্ষ্মণ যে মাপের ক্রিকেটার, তাতে তাঁর অবসর নিশ্চিতভাবে রাজকীয় হওয়া উচিত ছিল। অথচ, ক্রিকেট জীবনের সায়াহ্নে তিনি প্রাপ্য মর্যাদা পেলেন না। বলা ভাল, ক্রিকেট জীবনে কখনোই সঠিক বিচার পাননি তিনি। ধীরে ব্যাটিং করেন— এই যুক্তিতে তাঁকে অনেক আগেই একদিনের ক্রিকেট থেকে সরিয়ে দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। অতিরিক্ত বোলার খেলানোর জন্য তাঁকে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হয়েছে অনেকবার। তবু, দেশ বা দলের স্বার্থে লক্ষ্মণ সব মেনে নিয়েছেন মুখ বুজে। জাতীয় দল থেকে তাঁকে বাদও পড়তে হয়েছে কয়েকবার। এতকিছু সত্ত্বেও লক্ষ্মণের ব্যাটিং শৈলীতে কখনও খামতি দেখা যায়নি। বরং বার বার দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে প্রতিপক্ষের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দায়িত্ব নিয়ে ঢেকে দিয়েছেন সতীর্থদের ব্যর্থতা। শুধুমাত্র দেশের মাটিতে নয়, বিদেশে সবুজ উইকেটেও অনেকের থেকে অনেক বেশি সাবলীল ছিলেন তিনি। তার থেকেও বড় কথা ভারতীয় ক্রিকেটে তিনিই সম্ভবত শেষ সাচ্চা জেন্টলম্যান। ১৬ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে কখনও বিতর্কে জড়াননি। প্রতিপক্ষের কোনও খেলোয়াড়কে বা কোনও সতীর্থকে অসম্মান করেননি। শুধু প্রচারের আলো থেকে খানিকটা দূরে থেকেই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আর এই সবের জন্য তিনি ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিত হয়েছেন 'ভেরি ভেরি স্পেশাল' নামে। তাঁর ব্যাটিং শৈলী, দক্ষতা, মানসিকতা, ভদ্রতা, পরিমিতি বোধ এবং সর্বোপরি পারফরমেন্স, সবকিছু একসঙ্গে করলে এই উপমা যথার্থ। ১৯৯৬ সালের ২০ নভেম্বর আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক ভি ভি এস লক্ষ্মণের। তার পর দেশের হয়ে তিনি খেলেছেন ১৩৪টি টেস্ট ম্যাচ। মোট রান করেছেন ৮৭৮১। গড় ৪৫.৯৭। সর্বোচ্চ ২৮১। শতরান ১৭টি। আর অর্ধশতরানের সংখ্যা ৫৬টি। আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচে তাঁর যাত্রা শুরু ১৯৯৮ সালের ৯ এপ্রিল, কটকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। দেশের হয়ে ৮৬টি একদিনের ম্যাচে তিনি করেছেন ২৩৩৮ রান। গড় ৩০.৭৬। সর্বোচ্চ ১৩১। শতরান ৬টি এবং অর্ধশতরান ১০টি। পরিসংখ্যান থেকেই একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট— প্রথম থেকেই ভি ভি এস লক্ষ্মণকে টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন জাতীয় নির্বাচক এবং কর্তারা। সেই লাগিয়ে দেওয়া তকমা থেকে কেরিয়ারের শেষদিন পর্যন্ত মুক্ত হতে পারেননি এই হায়দরাবাদি। তা নিয়ে একাধিকবার প্রকাশ্যে এবং ঘনিষ্ঠ মহলে নিজের ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তিনি। দ্রুত রান তুলতে পারেন না, এই অভিযোগই একদিনের ক্রিকেটে তাঁর খেলার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় বাধা হয়েছে সবসময়। অথচ, তা যে সঠিক নয়, তার প্রমাণ লক্ষ্মণের ঘরোয়া টি টোয়েন্টি ম্যাচের পরিসংখ্যান। ২৫টি ম্যাচ খেলে তিনি করেছেন ৪৯১ রান। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৭৮। গড় ২২.৩১। অর্ধশতরান তিনটি। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাইক রেট ১১৪.৭১। তাও কেরিয়ারের শেষদিকে এসে তিনি কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। একদম ফেলে দেওয়ার মতো নয়। অর্থাৎ, যে অভিযোগে তাঁকে নির্ধারিত ওভারের ক্রিকেট থেকে বার বার দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। টেস্ট ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্তরে যিনি দেড় দশক ধরে সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন তাঁর টেকনিক, মানসিকতা, দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাজমান অসংখ্য বঞ্চনার ঘটনার মধ্যেই একটি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এই বিষয়টিকেও।

ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপের দেড় দশকের অন্যতম স্তম্ভ সম্ভবত সবথেকে বেশি অপমানিত হলেন অবসর নেওয়ার প্রাক মুহূর্তে। অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অবসরের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ফোন করেছিলেন তিনি। কিন্তু, মাহি ফোন ধরেননি। এই অপমানের কথা প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন তিনি। আসলে, ধোনি জাতীয় দলের নেতৃত্ব পাওয়ার পর থেকেই চাইছিলেন সিনিয়াররা সরে যান। যাতে জুনিয়রদের নিয়ে নিজের পছন্দমতো দল গড়তে পারেন তিনি। বেশ কয়েকবার তারুণ্যের পক্ষে সওয়াল করতে শোনা গিয়েছে ভারত অধিনায়ককে। তাই সৌরভ, কুম্বলে, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণের অবসর নিয়ে তিনি যতই আবেগ তাড়িত ভাষণ দিন না কেন, মনে মনে তিনি আসলে খুশিই হয়েছেন। যদিও ক্রিকেটার হিসেবে এঁরা সকলেই ধোনির থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে। লক্ষ্মণের ফোন না ধরা নিয়ে ধোনি সাফাই দিয়েছেন, তিনি সাধারণত ফোন ধরেন না। হাস্যকর। দলের একজন সিনিয়র নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার আগে ফোন করছেন, অথচ অধিনায়ক যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন না— এটা অসভ্যতা। ঔদ্ধত্য। সে তিনি যতই এক জোড়া বিশ্বকাপ দিন দেশকে বা টেস্ট ক্রিকেটে কয়েক মাসের জন্য দলকে বিশ্বের এক নম্বর করুন না কেন। নিজের বাড়িতে ধোনিকে বাদ দিয়ে দলের অন্যদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমুচিত জবাব দিয়েছেন লক্ষ্মণ। ঠিক যে ভাবে 'অসভ্য' অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে বার বার গর্জে উঠেছে তাঁর ব্যাট। ক্রিকেট কেরিয়ারের সর্বশেষ শটেও লক্ষ্মণ দেখিয়ে দিলেন তাঁর কব্জির ভেলকি। চ্যাম্পিয়নরা এভাবেই খেলেন। প্রতিপক্ষকে জবাব দেওয়ার সুযোগটুকুও দিতে পছন্দ করেন না। কিন্তু, এবার কবজির ভেলকি আমাদের কে দেখাবেন? ⌘⌘

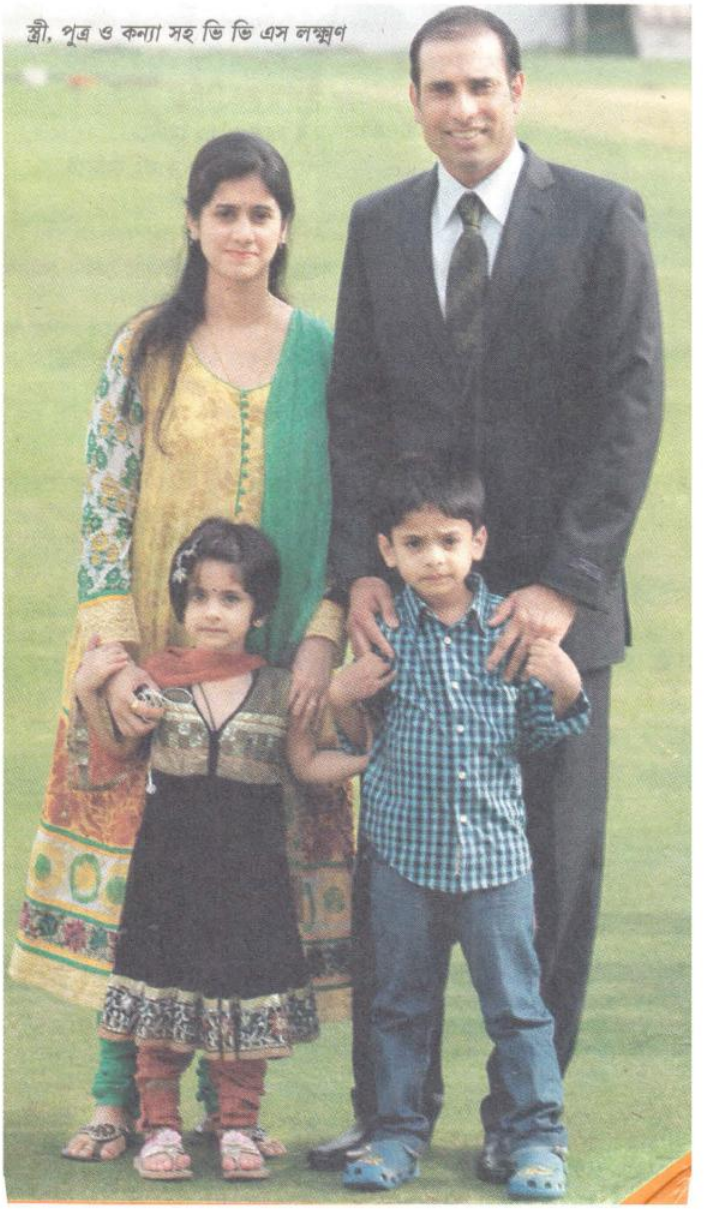

স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সহ ভি ভি এস লক্ষ্মণ

ভাগ্য সাপ্তাহিক রাশিফল

২ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

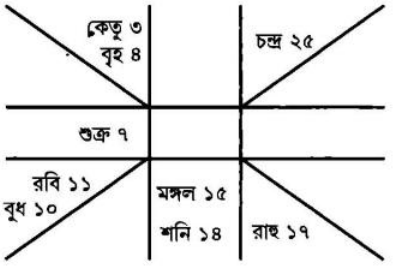

৪ সেপ্টেম্বর চন্দ্র মেষ রাশিতে যাবে দিবা ৯।২৫ মিনিটে
শুক্র পুষ্যা নক্ষত্রে যাবে দিবা ৯।৩৫ মিনিটে
বুধ পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে যাবে রাত্রি ২।৫১ মিনিটে
৬ সেপ্টেম্বর চন্দ্র বৃষ রাশিতে যাবে রাত্রি ৯।৩২ মিনিটে

মেষ : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা শুভ। শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও সফলতা আসবে। উচ্চবিদ্যার জন্য বিদেশ যাওয়ার কথা চলতে পারে বা যোগাযোগ হতে পারে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। সপ্তাহটা যাবে কর্মব্যস্ততার মধ্যে। ব্যবসা থেকে লাভবান হবেন। বিনিযোগ করলে মন্দ হবে না। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

বৃষ : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না এ সপ্তাহে। তবে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সমস্যায় পড়তে হবে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সফলতা আসবে। উচ্চবিদ্যার্থীদের পড়াশুনোয় সাফল্যের সঙ্গে সুনাম হবে। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। পরিশ্রম অনুযায়ী উপার্জন না হওয়ায় হতাশ হতে হবে। ব্যবসায় তেমন একটা মুনাফা হবে না। চাকরিজীবীদের পরিশ্রম বেশি হবে এ সপ্তাহে। দাম্পত্যজীবনে নানা ঝঞ্ঝাট আসবে।

মিথুন : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে সমস্যা তেমন হবে না। এ সপ্তাহে কাছাকাছি ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। শিক্ষায় সাফল্য এলেও উচ্চবিদ্যার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হবে। পরিশ্রম করেও আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারবেন না। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। এ সপ্তাহে ব্যয় বেশি হবে। সে কারণে একটু চাপের মধ্যে থাকতে হবে। ব্যবসায় নানা সমস্যা দেখা দেবে। চাকরিজীবীদের গতানুগতিকভাবে চলবে। দাম্পত্যজীবন মধ্যম।

কর্কট : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না এ সপ্তাহে। তবে মাঝে মধ্যেই মেজাজ হারিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও উচ্চবিদ্যায় সফলতা আসবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। আয় যেমন হবে ব্যয়ও হবে ততধিক। ব্যবসায় লাভ হলেও নানা ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হবে। চাকরিজীবীদের গতানুগতিক চলবে। দাম্পত্যজীবন শুভ নয়।

সিংহ : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা শুভ। যেসব জাতক/জাতিকা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন, এ সপ্তাহে অনেকটা সুস্থ বোধ করবেন। পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও সফলতা আসবে। তবে ছাত্রছাত্রীরা একটু সতর্ক থাকবেন। বন্ধুদের পরামর্শে চলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। উপার্জন ভাগ্য শুভ। নতুন নতুন যোগাযোগ পাবেন। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কন্যা : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে নানা সমস্যা ভোগ করতে হবে। বিশেষ করে চোখের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। উপার্জন ভাগ্য তেমন শুভ নয়। এ সপ্তাহে ভাগ্যের সাহায্য তেমন পাবেন না। যে কোনও শুভ কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হবেন। ব্যবসায় তেমন ভাল কিছু আশা করবেন না। চাকরিজীবীদের কর্মসূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। দাম্পত্যজীবন শুভ হলেও কুটুম্বদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।

তুলা : জাতক/জাতিকারা সপ্তাহের প্রথম দুটি দিন একটু সতর্ক থাকবেন। কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে নিজেকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। ভাগ্যের সহযোগিতা তেমন পাবেন না। অর্থভাগ্য শুভ। এ সপ্তাহে ব্যবসা থেকে ভাল কিছু আশা করতে পারেন। চাকরিজীবীদের খুব কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। দাম্পত্যজীবন শুভ নয়। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে।

বৃশ্চিক : জাতক/জাতিকাদের শরীর তেমন ভাল যাবে না। আঘাতজনিত কারণে শারীরিক অস্থিরতা বাড়বে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। হঠকারী সিদ্ধান্তে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। ব্যবসা খুব একটা ভাল যাবে না। কাজের চাপ থাকলেও টাকা বাজারে আটকে থাকবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা মধ্যম। দাম্পত্যজীবন শুভ।

ধনু : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা মধ্যম। শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। তবে লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলবেন। তাই সাবধান, একটু সতর্ক থাকুন এ বিষয়ে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে নানা সমস্যা আসবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। পরিশ্রম যেমন করবেন ভাগ্যের সহযোগিতাও পাবেন। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মকর : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা মধ্যম। এ মাসটা শরীর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। তবে সতর্ক থাকবেন শত্রুদের থেকে। ঝুঁকি নিয়ে কোনও কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সময়টা মধ্যম। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায় তেমন একটা মুনাফা হবে না। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কুম্ভ : জাতক/জাতিকাদের শরীর নিয়ে নানা সমস্যা থাকবে এ সপ্তাহে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও পারিপার্শ্বিক নানা সমস্যার কারণে মাঝে মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। অহেতুক ব্যয় খুব চাপের মধ্যে রাখবে। কোনও প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অর্থ নষ্ট হতে পারে, সাবধান থাকুন। চাকরিজীবীদের গতানুগতিক চলবে। ব্যবসায় তেমন একটা লাভ হবে না। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মীন : জাতক/জাতিকাদের সপ্তাহটা মধ্যম। শরীর, মন কোনওটাই ভাল যাবে না। শরীর নিয়ে ছোট ছোট সমস্যা চিন্তায় রাখবে। সন্দেহপ্রবণতার কারণে লোকের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। পড়াশুনোয় সাফল্য আসবে। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। শারীরিক কারণে কিছু অর্থব্যয় হবে। ব্যবসা তেমন একটা ভাল যাবে না। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ। ⌘⌘

শ্রীকৌস্তুভ

সুস্থ শরীর মানেই আশীর্বাদ

যা পেতে আমরা আপনাকে সাহায্য করি।

Care for Life
GDDI

জি ডি মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল আধুনিক যুগের স্বাস্থ্য পরিষেবা, উন্নততম নবপ্রযুক্তি এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সহ আপনার পরিষেবায় প্রস্তুত। সুলভ মূল্যে যথাচিত যত্ন, পরিষেবা এবং আত্মবিশ্বাস সহ আপনাকে সুস্থ করে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। *আপনার স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় প্রতিটি চিকিৎসার প্রতি আমরা সবচেয়ে বেশী যত্নশীল তাই আমরা* আপনাকে প্রদান করি সম্ভাব্য সঠিক নিরাময়, আমাদের প্রতি আপনার এই আস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে আমাদের সাহায্য করে।

২৪ ঘন্টার পরিষেবা

- এ্যাডমিশন • ক্রিটিক্যাল কেয়ার (আই সি ইউ)
- রেডিওলজি ও ইমেজিং • প্যাথোলজি • অ্যামবুলেন্স

হেল্‌থ চেক-আপ স্কিমস্ ও প্যাকেজ

- ডায়াবেটিস মনিটরিং প্যানেল • ল্যাপ কোলি • টি ইউ আর পি
- ফেকো ও প্রিমিয়াম আইওএল প্যাকেজেস
- মাস্টার হেল্‌থ চেক-আপ
- জেনারেল ল্যাপারোস্কোপি, গাইনোকোলজি এবং ম্যাটারনিটির জন্য সার্জিক্যাল প্যাকেজ
- স্বাভাবিক প্রেগন্যান্সি চেক-আপ এবং অন্যান্য পরিষেবা

ডায়াগনোস্টিক পরিষেবা

- ৬৪-স্লাইস সিটি স্ক্যান সঙ্গে সিটি অ্যাঞ্জিও • ফুলবডি এম আর আই
- ইকোডপলার/টি এম টি • থ্রিডি ইউ এস জি • এণ্ডোস্কপি
- কোলোনস্কপি ও পি জি • ইউরো ফ্লোমেট্রি
- ই সি জি/ই ই জি/ই এম জি/এন সি ভি
- হোল্টার মনিটর • লাং ফাংশান টেস্ট • ফুট কেয়ার • ডিজিটাল এক্স-রে

বিশেষ পরিষেবা

- আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট (ও পি ডি) • ডায়াবেটিস কেয়ার • ডায়ালিসিস
- আই কেয়ার • ডেন্টাল কেয়ার • অর্থোপেডিক কেয়ার • ইউরোলজি কেয়ার
- কার্ডিয়াক কেয়ার • সকল গাইনোকোলজি এবং পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের জন্য বিশেষ আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট
- উওম্যান হেল্‌থ, ম্যাটারনিটি এবং চাইল্ড কেয়ার পরিষেবা

সকালের বহির্বিভাগ
১০০টাকা
সোম-শনি-সকাল ৮টা-দুপুর ২টা
ফলো-আপ সাতদিনের মধ্যে
জিডিডিআই-এর রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে
বিনামূল্যে

DILKHUSH MEMORIAL
WOMAN AND CHILD CARE

24 Hours HELP LINE 3987-3987

Website: www.gddihealthcare.com

139A, Lenin Sarani, Kolkata - 700 013
E-mail : info@gddihealthcare.com
Website : www.gddihealthcare.com

G D HOSPITAL & DIABETES INSTITUTE

A MULTI-SPECIALITY HEALTHCARE DESTINATION

পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটি সংস্থা

KOLKATA WEST

An exclusive gated community with villas
Your own landed homes with a private green
25 minutes drive from Park Street
30 minutes drive from Airport via Belgharia Expressway
Areas ranging from 1069 to 4500 sqft.
High-end finishes

Limited edition homes waiting for the select few

A few ready to move in villas available

vichitra
THE RETAIL ARCADE

MEDICAL CENTRE to be run by Sanjiban Hospitals

opening shortly

Launching soon
Lavanya
The Apartments

A project by
USE Infra

Project supported by
LIC HOUSING FINANCE LTD.

Ph: 033 3002 6000 Email: sales@kwic.co.in
or Call: Aveek: **+91 98367 00021**, Soumitra: **+ 91 98742 88088**, Soumen: **+ 91 90517 02227**

Kolkata West International City, Unit No. A/9/20, Salap Junction, Howrah Amta Road and Bombay Road Crossing, NH6, Howrah - 711 403